উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেষ্টার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

কোর পত্র - ১০১

পর্যায় - খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক-১ প্রাচীন যুগ

একক-২ প্রাক্-চৈতন্য যুগ

একক-৩ চৈতন্য যুগ

একক-৪ উত্তর-চৈতন্য যুগ

একক-৫ নাথসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য

একক-৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও মধ্যযুগের মুসলমান কবি

একক-৭ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

পর্যায় খ

একক-৮ আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়

একক-৯ আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায

একক-১০ বাংলা কাব্যে নবযুগ

একক-১১ উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

একক-১২ রবীন্দ্রযুগ

একক-১৩ রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

একক-১৪ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য

কোর পত্র - ১০১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

একক-৮

আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়- অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ, বাংলা গদ্যের আদিপর্ব, বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি, বাংলা গদ্যের নবজাগরণ

একক-৯

আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়-প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ

একক-১০

বাংলা কাব্যে নবযুগ- রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল

একক-১১

উপন্যাস ও প্রবন্ধ নিবন্ধ- উপন্যাসের ভূমিকা, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সীতাদেবী ও শান্তা দেবী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রবন্ধ নিবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ও অন্যান্য প্রাবন্ধিক

একক-১২

রবীন্দ্রযুগ- রবীন্দ্রযুগ-ভূমিকা, কাব্য-কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ

একক-১৩

রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-নিবন্ধ

একক-১৪

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য- সূচনা, কবিতার নতুন ধারা, সাম্প্রতিক নাটক, কথাসাহিত্যে আধুনিকতা, সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ

একক-৮ আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়

বিন্যাসক্রম

৮.১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

৮.২। বাংলা গদ্যের আদিপর্ব

৮.৩। বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি

৮.৪। বাংলা গদ্যের নবজাগরণ

৮.৫। নির্বাচিত প্রশ্ন

৮.৬। সহায়ক গ্রন্থ

৮.১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে তীরবর্তী নাগরিক কেন্দ্র থেকে সদ্য-গঠিত কলকাতার বিত্তবান সমাজে একপ্রকার লঘু ধরনের গীতিবাদ্য, যাত্রাপাঁচালি প্রভৃতি বিশেষ প্রচলন ছিল। তখন পরাতন ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে, নতুন শিক্ষাসব্যতার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়নি, অথচ নাগরিক সমাজের অনেকের হাতে কাঁচা টাকা জমেছে প্রচুর।

নিতাই বৈরাগী, নীলমনি পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা, ভোলা ময়রা, জগন্নাথ বেনে, কেষ্টা মুচি, গুরো দুম্বো, ভীমদাস মালাকার, বলরামদাস কপালী, মতি পসারী, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ইত্যাদি কবিওয়ালারা অভিজাত্যে যেমন উচ্চ বৃক্ষারূঢ় ছিলেন না, তেমনি শিক্ষাদীক্ষা প্রায় কারও ছিল না।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কয়েকজন কবিওয়ালার নাম লেখো।

উত্তর ঃ নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, মতি পসারী, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ।

মন্তব্য

৮.২। বাংলা গদ্যের আদিপর্ব

উনিশ শতকের পূর্ববর্তী যাবতীয় সাহিত্যকর্মে পয়ার জাতীয় ছন্দই ব্যবহৃত হত - তা সে কাব্যকাহিনি হোক, আর নীরস ঘটনাবিবৃতিই হোক। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মতো গদ্যাত্মক গ্রন্থ, যাতে দার্শনিক চিন্তাই সর্বাধিক, তাও পয়ার-ত্রিপদীতেই রচিত হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব-সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসও ছন্দে লেখা হয়েছে। এমনকি আয়ুর্বেদ গ্রন্থও বাংলা পয়ারের বন্ধন স্বীকার করেছিল।

বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগিজ বণিক ও বোম্বেটের দল আসতে শুরু করেছিল। তাদের সন্ত্রাসের কথা এখনও ইতিহাসে দুঃস্বপ্নের মতো বেঁচে আছে। তাদের পিছু পিছু মিশনারি সম্প্রদায়ও এ-দেশে এসে ছলে বলে কৌশলে বাংলার গ্রামে গ্রামে গির্জাঘর বানিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের ধরে ধরে খ্রিস্টান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের জন্য সুদূরপ্রসারী ছিল।

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনার বশবর্তী হয়েই বাংলা গদ্যে কলম ধরেছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যরস বা শিল্পসৃষ্টি তাঁর কেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), 'উপনিষদের অনুবাদ' (১৯১৫-১৯)। বিতর্কমূলক রচনা মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৩) প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রামমোহনের দুটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার'।

২। রামমোহনের দুটি বিতর্কমূলক রচনার উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'পথ্যপ্রদান'।

৮.৩। বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি

মন্তব্য

সাহিত্যের ইতিহাস পুরাতন যুগ যাই-যাই করেও কিছুকাল রয়ে যায়, রয়ে যায় তার গলিত রীতিনীতি, রচনাবস্তুর কঙ্কালমূর্তি। তারপর যখন নবজীবনের উদ্দাম বন্যা নামে তখন পুরাতন ধুয়েমুছে যায়, এবং সেই পঙ্কস্তরে নতুন যুগের সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কাব্যে পুরাতন পালাবদলের কোনো ইঙ্গিত ফুটে ওঠেনি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ-

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি ও কাব্যকবিতায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইতিপূর্বে সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর বিখ্যাত সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিত প্রতিভা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁকে একাধিক সাময়িক পত্র পরিচালনা করতে হয়েছে, সংবাদপত্রের জঠর পূর্তির জন্য বহু কবিতা লিখতে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা, প্রবন্ধাদি লিখতেন, গুপ্তকবিকে গুরু বলেই স্বীকার করেছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঃ-

মদনমোহন তর্কালঙ্কার পুরাতন রীতির শেষ কবি। ১৮৫৮ সালে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান হয়। মদনমোহন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, অধ্যাপনা ও সরকারি চাকুরিতে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'রসতরঙ্গিনী' (১৮৩৪) এবং 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬) নামে তাঁর দুটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তখনো তিনি যৌবনে পুরোপুরি পদার্পন করেননি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ঈশ্বর গুপ্ত কোন্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

উত্তর ঃ 'সংবাদ প্রভাকর'।

মন্তব্য

২। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৪) এবং 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬)।

৮.৪। বাংলা গদ্যের নবজাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্য সাময়িক পত্রিকা ও বিতর্ক সংকুল আন্দোলনের মধ্যেই বন্দি হয়ে ছিল, বৃহত্তর সাহিত্যকর্মে তখনও তার বিশেষ ডাক পড়েনি। কারণ সেটা হল সামাজিক ভাঙাগড়ার যুগ, নানা সমস্যায় সাধারণের মন তখন উদ্বিগ্ন, নানা চিন্তায় সকলে জর্জরিত।

অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ-

অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। অক্ষয়কুমার দত্তকে আবেগব্যাকুল বাঙালি সমাজের ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। সারাজীবন তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা করেছেন, বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির চর্চা করেছেন।

অক্ষয়কুমার অনেকগুলি স্কুল পাঠ্যশ্রেণীর পুস্তিকা লিখেছিলেন। যথা - 'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ' (১৮৫৩-৫৯), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)। গ্রন্থগুলি মূলত বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে ছাত্রদের জন্য রচিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ-

পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর গত শতাব্দীর একটি প্রচণ্ড বিস্ময়রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর বিচিত্র জীবনকথা, অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি - এ সমস্ত আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

বাংলা গদ্যের জনকত্ব নিয়ে প্রায়শই সুধীমহলে খর তর্কের ঝড়তুফান উঠে থাকে। কেউ বলেন রামমোহন বাংলা গদ্যের জনক।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান লেখকদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। হিন্দুসমাজ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন করেছিল, প্রধানত মধ্যবিত্ত সমাজই এই ঐতিহ্যের নেতৃত্ব করেছিলেন। কিন্তু

তখনো মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব হয়নি, উপরন্তু নানা কারণে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। অক্ষয়কুমার দত্তের স্কুল পাঠ্যশ্রেণীর পুস্তিকার নাম কী?

উত্তর ঃ 'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ' (১৮৫০-৫৯), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)।

৮.৫। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বাংলা গদ্যের আদিপর্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি কীভাবে বিস্তৃত হয়েছিল আলোচনা করো।

৩। বাংলা গদ্যের নবজারণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮.৬। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার।

একক-৯ আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়

বিন্যাসক্রম

৯.১। প্যারীচাঁদ মিত্র

৯.২। কালীপ্রসন্ন সিংহ

৯.৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯.৪। রাজনারায়ণ বসু

৯.৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন

৯.৬। মধুসূদন দত্ত

৯.৭। দীনবন্ধু মিত্র

৯.৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৯.৯। নির্বাচিত প্রশ্ন

৯.১০। সহায়ক গ্রন্থ

৯.১। প্যারীচাঁদ মিত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দাবি করে থাকে। প্যারীচাঁদের গ্রন্থের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তিনিই সর্বপ্রথম আখ্যানকে নক্সার খর্বতা থেকে তুলে উপন্যাসের পথ প্রস্তুত করেন। আধুনিক উপন্যাস শিল্প গঠনে কয়েকটি মৌলিক উপাদন লক্ষ্য করা যায়- ১) কাহিনি, ২) চরিত্র, ৩) স্থানীয় পরিবেশ, ৪) সংলাপ, ৫) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং ৬) ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন। কাহিনিগ্রন্থনে ও চরিত্র নির্মাণে প্যারীচাঁদ আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দাবি করতে পারে কোন্ রচনাটি?

উত্তর ঃ প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'। মন্তব্য

২। আধুনিক উপন্যাস শিল্প গঠনে মৌলিক উপাদনগুলি কী কী?

উত্তর ঃ কাহিনি, চরিত্র, স্থানীয় পরিবেশ, সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন।

৯.২। কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার মধ্যে কেউ কেউ খাঁটি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার নাগরিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রদুষ্টি, নানা কদাচার ইত্যাদি কুৎসিত দৃশ্য হুতোমের নকসায় এমন জীবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যে এর অদ্ভূত সাহিত্যরস প্রশংসা দাবি করতে পারে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ কী রচনা করেন?

উত্তর ঃ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'।

৯.৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা ও সংগঠকরূপে দেখেছি বলে বাংলা গদ্যসাহিত্যে ও গদ্যরীতিতে তাঁর দান প্রায় ভুলতে বসেছি। 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১৮৫০, 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২), 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১ এবং ১৮৬৬), 'জ্ঞান ও ধর্মে উন্নতি' (১৮৯৩) প্রভৃতি ছোটো-বড়ো অনেকগুলি গদ্যনিবন্ধে তাঁর গদ্যশিল্পীর প্রতিভা সুপ্রমাণিত হয়েছে। তবে তাঁর অধিকাংশ রচনা ব্রাহ্মধর্ম-ঘেঁষা এবং সমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বলে উক্ত সম্প্রদায়ের বাইরে পুস্তিকাগুলির বিশেষ প্রচার হয়নি - এইজন্য অনেকে তাঁর গদ্যরীতির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কয়েকটি গদ্য-নিবন্ধের নাম লেখো।

মন্তব্য

উত্তর ঃ 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১৮৫০, 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২), 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১ এবং ১৮৬৬), 'জ্ঞান ও ধর্মে উন্নতি' (১৮৯৩)।

৯.৪। রাজনারায়ণ বসু

দেবেন্দ্র-প্রভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রাজনারায়ণ বসু বাংলা গদ্যের একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক বলে গৃহীত হয়েছেন। তাঁর চরিত্র, শিক্ষা, স্বদেশপ্রেম ও ধর্মানুরাগ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। তাঁর রচিত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানগুলিতে মহর্ষির মতোই একটি স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। সহজ, সুললিত ও প্রসন্ন গদ্যরীতিটি তিনি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন। 'হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৫), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭), 'আত্মচরিত' (১৯০৯) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর মনীষা ও গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রাজনারায়ণ বসু রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'আত্মচরিত' (১৯০৯)।

৯.৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন

রামনারায়ণ তর্করত্ন সে যুগের এক কদর্য প্রথাকে অবলম্বন করে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকটি লিখেছিলেন যা তাঁকে অদ্যাবধি স্মরণীয় করে রেখেছে। রামনারায়ণের পরের নাটক 'নবনাটক' (১৮৬৬) বহুবিবাহ প্রথাকে নিন্দা করে রচিত হয়। রামনারায়ণ সংস্কৃত থেকে কটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন - ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' (১৮৬০) ও ভবভূতির 'মালতীমাধব' (১৮৬৭)। রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকের মধ্যে তিনটি প্রহসন উল্লেখযোগ্য - 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫), 'উভয়সঙ্কট' (১৮৬৯) ও 'চক্ষুদান' (১৮৬৯)।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন কারণ

নবজাগ্রত যুগের ভাবনাকে তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন। সমাজসচেতন মৌলিক বাংলা নাটকের তিনিই প্রথম স্রষ্টা। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রধান নাটক কোনটি?

উত্তর ঃ 'কুলীনকুল সর্বস্ব'।

২। রামনারায়ণ অনুবাদ করেছেন এমন দুটি নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮)।

৯.৬। মধুসূদন দত্ত

বাংলা নাট্যমঞ্চে মধুসূদনের আবির্ভাব কিছুটা আকস্মিক ভাবেই।

মধুসূদন দুটি পৌরাণিক নাটক লিখেছেন ঃ 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' মহাভারতের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) - যযাতি, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার পরিচিত কাহিনিই এর বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' ও (১৮৬০) পৌরাণিক নাটক। তবে এর ভিত্তি ভারতীয় পুরাণ নয়, গ্রীক পুরাণ।

ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) মধুসূদনের বিশিষ্ট সৃষ্টি এবং বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটকও বটে। রাজপুত ঐতিহাসিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করে 'কৃষ্ণকুমারী রচিত - টডের রাজস্থান গ্রন্থ এর অনুপ্রেরণা।

মধুসূদনের দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) তাঁর বিস্ময়কর সৃজনক্ষমতার পরিচয় বহন করে। এই নাটক দুটি বাংলায় শ্রেষ্ঠ প্রহসনের সম্মান পেতে পারে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মধুসূদনের পৌরাণিক নাটক দুটি কী কী ?

উত্তর ঃ 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'।

মন্তব্য

২। মধুসূদন দত্ত রচিত ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটক কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'কৃষ্ণকুমারী'।

৩। মধুসূদনের প্রহসন দুটির নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'।

৯.৭। দীনবন্ধু মিত্র

বাংলা নাটককে সৃষ্টির এক অত্যুচ্চ ভূমিতে উপনীত করেন দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেল মধুসূদনের সৃষ্টিতে যে নাটকের সার্থক প্রকাশ ঘটে দীনবন্ধু তাকে আরো পূর্ণ ও বিকশিত করে তোলেন। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নীলকরদের অত্যাচারের ওপর ভিত্তি করে লেখা প্রায় সত্য কাহিনির রূপায়ণ।

সিরিয়াস ও ভাবগম্ভীর নাটকের মতো প্রহসন রচনায়ও দীনবন্ধু অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দীনবন্ধুর কৌতুকব্যঙ্গ ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে তাঁর প্রহসনগুলি। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) নাটক ঘটনার বৈচিত্র্য জটিল এবং নাটকীয়তায় তীব্র। নাটকে দুটি কাহিনি আছে - একটি প্রেমমূলক অপরটি হাস্যরসাত্মক। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে এক বৃদ্ধ রাজীবলোচন মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘড়ে রোঁ' নাটকের ভক্তপ্রসাদের মতো আপাত সুরসিক, ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত, নিজের বিধবা কন্যাদের প্রতি নির্মম দয়াহীন 'জামাই বারিক' (১৮৭২) দীনবন্ধু বিচিত্র ভাবের প্রহসন। 'লীলাবতী' (১৮৬৭) দীনবন্ধু পরিণত ভাবনার ফসল। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটনার দ্বন্দ্বে নাটকটি সার্থক। নাটকের বিষয় প্রেম; প্রেমের বিলাস ও বৈচিত্র্য নাটকে আছে। দীনবন্ধুর শেষ নাটক 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) যাতে ইতিহাসকে আনা হয়েছে ও ঐতিহাসিক গম্ভীর পরিবেশে সৃষ্টির চেষ্টা আছে।

১৮৬৬ সালে লেখা 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর অমর সৃষ্টি। তদানীন্তন বাংলার যুবসমাজের অপরিমিত মদ্যপান, অন্য নারীদরে প্রতি অবৈধ আকর্ষণ, সার্বিক নীতিহীনতা এতে রূপ পেয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকটি নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ নীলদর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)।

৯.৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সে সময়ে নাটকের যে জ্যোতির্ময় সৌরমণ্ডল ছিল তার প্রধান পুরুষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র মূলত ছিলেন অভিনেতা। তিনি যে সময়ের নাটকে অভিনয় করেন, পরে বিশিষ্ট লেখকদের কাব্য বা উপন্যাস নাট্য রূপায়ণে দ্বারা মঞ্চের দাবী মেটান।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ-

১। **গীতিনাটক ঃ-** 'আনন্দরহো' (১৮৭৭), 'আগমনী' (১৮৭৭), 'অকালবোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' (১৮৭৮) ইত্যাদি।

২। **পৌরাণিক নাটক ঃ-** 'রাসলীলা' (১৮৮১), 'রাবণবধ' (১৮৮১), 'সীতার বনবাস' (১৮৮২), 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩), 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪), 'জনা' (১৮৯৪), 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) ইত্যাদি। 'জনা' তাঁর শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক।

৩। **'অবতার-মহাপুরুষ' নাটক বা মহামানবের জীবনী চরিত নাটক ঃ-** 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'নিমাই সন্ন্যাস' (১৮৮৫), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৫), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৮) ইত্যাদি।

৪। **সামাজিক নাটক ঃ-** 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮) ইত্যাদি।

৫। **ঐতিহাসিক নাটক ঃ-** 'মীরকাশিম' (১৯০৪), 'অশোক' (১৯০৪), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭) ইত্যাদি।

৬। **কৌতুক নাটক ঃ-** 'সপ্তমীতে বিসর্জন (১৮৮৫), 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬),

মন্তব্য

'বড়দিনের বখশিস' (১৮৮৭), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (১৮৯৪), 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' (১৮৯৬), 'আবুহোসেন' (১৮৯৭) ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। গিরিশচন্দ্রের দুটি গীতিনাটক কী কী?

উত্তর ঃ 'অনন্দরহো' (১৮৭৭), 'আগমনী' (১৮৭৭)।

২। গিরিশচন্দ্রের দুটি পৌরাণিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'রাসলীলা' (১৮৮১), 'রাবণবধ' (১৮৮১)।

৩। গিরিশচন্দ্রের দুটি সামাজিক নাটকের নাম কী?

উত্তর ঃ প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০)।

৪। গিরিশচন্দ্রের দুটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'মীরকাশিম' (১৯০৪), 'অশোক' (১৯০৪)।

৯.৯। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বাংলা গদ্যের বিকাশে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। বাংলা নাট্যধারায় রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩। বাংলা নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা নিজের ভাষায় লেখো।

৯.১০। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বঙ্গভূমিকা - সুকুমার সেন।

একক-১০ বাংলা কাব্যে নবযুগ

বিন্যাসক্রম

১০.১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১০.২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১০.৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১০.৪। নবীনচন্দ্র সেন

১০.৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী

১০.৬। দেবেন্দ্রনাথ সেন

১০.৭। গোবিন্দচন্দ্র দাস

১০.৮। অক্ষয়কুমার বড়াল

১০.৯। নির্বাচিত প্রশ্ন

১০.১০। সহায়ক গ্রন্থ

১০.১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায

ঈশ্বরগুপ্ত থেকে মধুসূদন এই পুরাতন ও নবীন যুগের দুই কবিপ্রতিনিধির মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদন নামক প্রজ্জ্বলিত উল্কার প্রস্তুতি রঙ্গলাল। ১৮৫৮ সালে হোমারের কবিতা অবলম্বনে লেখেন ব্যঙ্গ কাব্য 'ভেক ও মুষিকের যুদ্ধ'। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) রঙ্গলালের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কুমারসম্ভবের অনুবাদ' (১৮৭২) ও 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। Todd-এর বিখ্যাত গ্রন্থ Annals and Antiquities of Rajasthan' থেকে রাজপুত ইতিহাস সংগ্রহ করে রঙ্গলাল তিনি কাব্য লেখেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' যার মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান সর্বোৎকৃষ্ট।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ কাব্য কোনটি?

উত্তর ঃ 'ভেক ও মুষিকের যুদ্ধ'।

২। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কোন্ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত?

উত্তর ঃ Todd-এর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' অবলম্বনে রচিত।

১০.২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বাক্ষর রেখেছিলেন নাট্যকার রূপে। কিন্তু অচিরেই নাট্যকার মধুসূদনকে আবৃত করে আত্মপ্রকাশ করেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মহাকবি মধুসূদন।

'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) মহাকাব্যের কাহিনী উৎস মহাভারত, তবে বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থেও অপ্সরী তিলোত্তমার কাহিনি পাওয়া যায়।

'মেঘনাদবধকাব্য' (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ। 'রামায়ণ' মহাকাব্যের লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা- লক্ষ্মণের হাতে রাবণপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু এই কাব্যের কাহিনির অবলম্বন।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬৪) মধুসূদনের আর এক অভিনব শিল্পপ্রয়াস। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা'-কে 'ওড' জাতীয় রচনা বলেছেন। Ode হল "a long lyric poem, serious in subject, elevated in style and elaborate in its stanzaic structure." (M. H. Abrams)

মধুসূদনের 'বরীঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) সব অর্থেই অভিনব সৃষ্টি। পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ থেকে পত্রকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করে, অথচ বিষয়গত দিক থেকে ভারতীয় পুরাণ মহাকাব্যকে গ্রহণ করে, তারই মধ্যে আধুনিক রেনেসাঁসের জীবনধর্মকে নির্দিষ্ট করে মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কে এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি করে তুলেছেন।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) পাশ্চাত্য সনেটের আদর্শে রচিত। ইতালিতে সনেটের প্রথম উদ্ভব এবং পেত্রার্ক সনেটকে একটি সুন্দর শিল্পসম্মত রূপ দান করেন। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মাইকেল মধুসূদনের প্রধান মহাকাব্য দুটি কী কী?

উত্তর ঃ 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

২। Ode কী?

উত্তর ঃ "A long lyric poem, serious in subject, elevated in style and elaborate in its stanzaic structure."

১০.৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের মহাকাব্য সাধনার উত্তরপুরুষ। হেমচন্দ্রের প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক - ব্যঙ্গকবিতা, গীতিকবিতা, রূপক-কাব্য, অনুবাদ, মহাকাব্য ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সৃজন দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১) কবির বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় রচিত। 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) কোনো এক হিন্দু বীরের কথা নিয়ে কাল্পনিক আখ্যান। 'আশাকানন' (১৮৭৬) সাঙ্গ-রূপক কাব্য। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'দশমহাবিদ্যা'য় (১৮৮২) ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্য কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১)।

২। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হেমচন্দ্রের কাব্য কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২)।

মন্তব্য

১০.৪। নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট শিল্প ব্যক্তিত্ব। একই সঙ্গে তিনি গীতিকবি ও আখ্যান কাব্য প্রণেতা। 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করে পরাধীন বাংলার হৃদয়সম্রাট, আবার আধুনিক জীবনী-কাব্যের ধারায় তিনি নবসংযোজন।

নবীনচন্দ্র সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' গীতিকবিতার সংকলন।

নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) দীর্ঘ বিবৃতিমূলক ক্ষুদ্র রচনা। 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) স্কটের আদর্শে লেখা, অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে।

মহাভারত মহাকাব্যের আশ্রয়ে কৃষ্ণচরিত্রকে অবলম্বন করে নবীনচন্দ্র রচনা করেন 'রৈবতক'

(১৮৭৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) যারা একত্রে 'ত্রয়ী' কাব্যরূপে পরিচিত।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'অবকাশরঞ্জিনী'।

২। 'ত্রয়ী' কাব্যরূপে কোন্ কাব্যগুলি পরিচিত?

উত্তর ঃ 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'।

১০.৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলায় রোমান্টিক গীতিকাব্যের প্রথম স্রষ্টা ও সার্থক পদপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অনুগামী ও ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকে রচনায় বিহারীলালের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়, যেমন - 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ভাবে ও ভাষায় অগ্রজ কবির জ্যোতির্ময় ভাবনার স্পর্শ অনুভূত হয়।

বিহারীলালের গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮) তাঁর প্রথম বই। তাঁর প্রথম

কাব্যগ্রন্থ 'সংগীতশতক' (১৮৬২)। 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) কাব্যে কবি নারীচিত্র অঙ্কন করেছেন। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' (১৮৭০) সাতসর্গে বিন্যস্ত। 'সমুদ্রদর্শন', 'নভোমণ্ডল' প্রভৃতি এই কাব্যের উল্লেখ্য কবিতা। মন্তব্য

'বন্ধু-বিয়োগ' (১৮৭০) পয়ার ছন্দে চার সর্গে রচিত কবির প্রথমা পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর বেদনাময় স্মৃতিসুরভিত শোককাব্য। বিহারীলালের কবিপ্রাণের যথার্থ জাগরণ 'প্রেমপ্রবাহিণী' (১৮৭১) কাব্যে পাওয়া যায়। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হল 'বাউল বিংশতি' (১৮৮৭), 'দেবরাণী' (১৮৮২), 'ধূমকেতু' (১৮৯৯)।

'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এটি একান্তভাবে আত্মগত ও মন্ময় কাব্য। দেবী সারদার সঙ্গে কবির মিলনবিরহের অশ্রুভারাতুর ও আনন্দময় মুহূর্তগুলি এ কাব্যে রোমান্সের দ্বার খুলে দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বিহারীলালের গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮)।

২। বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯)।

১০.৬। দেবেন্দ্রনাথ সেন

দেবেন্দ্রনাথ সেন মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি হলেও পরবর্তী শতকেও তাঁর কাব্যসাধনা পরিব্যাপ্ত ছিল, সেজন্য আধুনিককালের মনোভাব তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ কুড়িটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখ্য 'ফুলবালা' (১৮৮০), 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১), 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'শেফালিগুচ্ছ' (১৯১২), 'পারিজাতগুচ্ছ' (১৯১২), 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২), 'অপূর্ব নৈবেদ্য' ইত্যাদি।

প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্যচেতনা দেবেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান অবলম্বন। তিনি প্রেমতন্ময় কবি - প্রেমের দীপশিখা তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছে যে আলোকদীপ্তিতে

মন্তব্য তিনি জীবনকে সুন্দর সমুজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দেবেন্দ্রনাথ সেনের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'ফুলবালা' (১৮৮০), 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১)।

১০.৭। গোবিন্দচন্দ্র দাস

গোবিন্দচন্দ্র দাস তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র চিহ্নিত কবি যিনি প্রবল জীবনপিপাসায় তীব্র ইন্দ্রিয়াসক্তিতে হৃদয় ভাবনার অকুণ্ঠ উৎসারণে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তিনি 'স্বভাব কবি' রূপে আখ্যাত হয়েছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ হল 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫), 'চন্দন' (১৮৯৬), 'ফুলরেণু' (১৮৯৬), 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৬) ইত্যাদি। কবির অবন্ধিত অকুণ্ঠিত অসংবৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২)।

১০.৮। অক্ষয়কুমার বড়াল

অক্ষয়কুমার বড়াল কাব্যক্ষেত্রে বিহারীলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বিহারীলালের প্রভাব তাঁর উপরই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রভাবও তাঁর ওপর অপ্রত্যক্ষ নয।

অক্ষয়কুমারে কাব্যসংখ্যা পাঁচ - 'প্রদীপ' (১৮৮৪) ও 'এষা' (১৯১২) যাদের মধ্যে কবিহৃদয়ের বৈচিত্রময় জীবনবোধ সুন্দর শিল্পরূপ পেয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫), 'ভুল' (১৮৮৭), 'শঙ্খ' (১৯১০) মন্তব্য
ও 'এষা' (১৯১২)।

১০.৯। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। মহাকাব্য রচনায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

২। গীতিকাব্য রচনায় বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রেনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের ভূমিকা নির্দেশ করো।

১০.১০। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-১১ উপন্যাস ও প্রবন্ধ নিবন্ধ

বিন্যাসক্রম

১১.১। উপন্যাসের ভূমিকা

১১.২। কালীপ্রসন্ন সিংহ

১১.৩। রমেশচন্দ্র দত্ত

১১.৪। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১.৫। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১.৬। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১.৭। সীতাদেবী ও শান্তা দেবী

১১.৮। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১১.৯। স্বর্ণকুমারী দেবী

১১.১০। প্রবন্ধ নিবন্ধ

১১.১১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১.১২। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ও অন্যান্য প্রাবন্ধিক

১১.১৩। নির্বাচিত প্রশ্ন

১১.১৪। সহায়ক গ্রন্থ

১১.১। উপন্যাসের ভূমিকা

মানুষের গল্প বলার প্রকৃতি সনাতন। তাই আধুনিককালের উপন্যাসের উৎস সন্ধানে সাহিত্যিকগণ ঐতিহাসিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগের আখ্যায়িকা ধর্মী নানা রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই আখ্যান-উপাখ্যানে রূপান্তর ঘটেছে। কল্পনা সমৃদ্ধ জীবনের বাস্তবতা বিমুখ কাহিনী ইংরেজিতে রোমান্স নামে খ্যাত। অনেকে মনে করেন এই রোমান্সই আধুনিক উপন্যাসের উৎস। ইতালিয়

লেখক বোক্কাচ্চিও চতুর্দশ শতাব্দীতে কতকগুলি বাস্তবধর্মী গল্প লিখে তাদের নাম দিয়েছিলেন নভেল্যা স্টোরি (Novella Stories)। অর্থাৎ নূতন গল্প। এর থেকে 'Novel' শব্দের উৎপত্তি। তাই Novel বাস্তবধমী জীবনাশ্রয়ী বিশ্বাস্য কাহিনী। মানুষের জীবনে যা প্রকৃত ঘটতে পারে, সামাজিক ও ব্যক্তিক চরিত্র যাতে সম্ভাব্য বিশ্বসনীয় বিকাশ লাভ করে; এমন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনেই নভেল বা উপন্যাসের কাহিনী কল্পনা করা হয়।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান সাহ্যিত্যে ও মধ্যযুগের ইতালিয় সাহিত্যে গল্পকথার প্রকাশ পাওয়া যায়। সেসবের মতো প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহু গদ্যরচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেখানে কোথাও কল্পনার প্রাধান্য, কোথাও বা কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ। সোমদেবের 'কথাসরিতসাগর', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', শিবদাসের 'বেতালপঞ্চবিংশতী', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', বানভট্টের 'কাদম্বরী', বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' ইত্যাদির মতো পালি জাতকেও গল্পরসের প্রচুর নিদর্শন আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র মতোই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর প্রাধান্য সত্ত্বেও মানবজীবনের প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ অবিস্মরণীয় বর্ণে দ্বিত্ব। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', 'মৈমনসিংহগীতিকা'-য় বাস্তব জীবনের আলেখ্য আরো গাঢ় বর্ণে চিত্রিত। পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগের এইসমস্ত আখ্যান, উপাখ্যানে উপন্যাসের নানা উপাদান ছড়ানো থাকলেও উপন্যাস বিশেষভাবে আধুনিককালের সৃষ্টি। এটি একটি 'Modern Art Form' বা আধুনিক কলারূপ।

চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাগত কৌতূহল রোমান্সের প্রধান উপজীব্য। সংক্ষেপে নভেল বাস্তবধর্মী। রোমান্সে কল্পনার প্রাধান্য, নভেল চরিত্রভিত্তিক। রোমান্স ঘটনামূলক, নভেলে জীবনটা থাকে প্রত্যক্ষ, রোমান্সে জীবনটা একটা দূরস্থিত কল্পলোকের বিষয় স্বরূপ। এলিজাবেথীয় যুগ থেকে ইংরেজিতে ভালো গদ্য রচিত হতে থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে উপন্যাসধর্মী গ্রন্থ রচিত হতে থাকে- John Bunyan-এর 'The Pilgrim's Progress'। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই উপন্যাস রচনা শুরু হয়, জোনাথন স্যুইফ্টের 'গালিভার্স ট্রাভেলস্', ড্যানিয়েল ডিফো-র 'রবিনসন ক্রুসো' প্রমুখের দ্বারা।

মন্তব্য

স্যামুয়েল রিচার্ডসনকে আধুনিক উপন্যাসের প্রথম রচয়িতা রূপে অভিহিত করা যায় এবং তাঁর 'Pamela' প্রথম যথার্থ উপন্যাস। প্রায় সমকালে হেনরি ফিলডিং লেখেন 'জোসেফ অ্যান্ড্রুজ'। এরপর থেকে ইংরেজি উপন্যাসের গৌরবময় অভিযাত্রা চলে যা আজও অনন্য।

ঊনবিংশ শতকের ছয়-এর দশকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিক উপন্যাসের প্রথম প্রবর্তন করেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক। বলা যেতে পারে, সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। অবশ্য বঙ্কিচন্দ্রের পূর্বে কয়েকজনের রচনায় উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক বলে অভিহিত হন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম উপন্যাস রচনার নক্শা অবতারণা করেন। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮৩৯), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩), 'নববিবিবিলাস' (১৯৩০) প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক আখ্যায়িকা রচনার মধ্যে উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গমের চিহ্ন লক্ষিত হয়।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটি রচনা করেন মিসেস হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্স ১৮৫২ সালে। এটি একটি ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর। এই গ্রন্থটি প্রচারমূলক হলেও দেশীয় খ্রিস্টান পরিবার বিশেষত স্ত্রী-চরিত্রের বর্ণনা এবং কাহিনির বাস্তবতায় কিছুটা উপন্যাসের রস সঞ্চিত হয়েছে। অনেকে মনে করে, ঔপন্যাসিক হিসাবে বিঙ্কমচন্দ্র ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী। ভূদেবের ঋজু, মর্মভেদী ও তির্যক দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ভাবকল্পনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ইতিহাসসাশ্রয়ী উপন্যাস শিল্পের জন্ম হয়েছে। ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত ইংরেজি 'Romance of History' নামক কাল্পনিক আদর্শে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের আছে দুটি বড়ো গল্প 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। 'Romance of History'-র প্রথম উপন্যাস দিয়ে রচিত 'সফলস্বপ্ন'-এ আছে একটি অসম্ভব নৈশ স্বপ্নের সফলতার বিবরণ। দ্বিতীয় কাহিনী 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ঔরঙ্গজেব কন্যা রোসেনারা ও শিবাজীর কাল্পনিক প্রণয়কে কেন্দ্র করে রচিত। অনেকে মনে করেন পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' এরই প্রভাব প্রসূত। যদিও বঙ্কিচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সৃষ্টির প্রতিভার সঙ্গে ভূদেবের কোনো তুলনা চলে না।

পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র রচনা করেন 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। মন্তব্য

অনেকে এই গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে দাবি করতে চান। তাঁর গ্রন্থে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি সর্বপ্রথম আখ্যানকে নক্‌শার খর্বতা থেকে তুলে উপন্যাসের পথ প্রস্তুত করেন। আধুনিক উপন্যাস শিল্প গঠনে কয়েকটি মৌলিক উপাদান লক্ষ্য করা যায় - ১) কাহিনি, ২) চরিত্র, ৩) স্থানীয় পরিবেশ, ৪) সংলাপ, ৫) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, ৬) ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন। কাহিনি গ্রন্থনে ও চরিত্র নির্মাণে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বৈদ্যবাটির জমিদার পুত্র মতিলাল কীভাবে কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে দারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করে আবার সৎপথে ফিরে আসে- এই নৈতিক তত্ত্বকথাটি এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। বাবুলাল বাবু, মতিলাল ও তার কুসঙ্গীরা, ঠক্‌চাচা, বাঞ্ছারাম এইসমস্ত চরিত্র আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষত ঠক্‌চাচা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। প্যারীচাঁদের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই গ্রন্থের ভাষা। বর্ণনা ও চরিত্রকে জীবন্ত করার জন্য লেখক তথ্য সংলাপের ব্যবহার করেছেন এবং সংলাপের দ্বারা নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তথাপি উপন্যাসের অন্যান্য আঙ্গিক বিচারে 'আলালের ঘরের দুলাল' খাঁটি উপন্যাসের মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। তাঁর উপন্যাসে মানবহৃদয়ের গোপনতম চিত্র নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যতটা স্রষ্টা; তার থেকে বেশি দ্রষ্টা। টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থ রচনা করতেন। প্যারীচাঁদের গ্রন্থের নিদর্শন তুলে ধরলে দেখা যায় তাঁর ভাষায় সহজ ঝরঝরে কথ্যভঙ্গি কীভাবে আধুনিক রীতির সূত্রপাত করেছে। ''একটু ২ মেঘ হইয়াছে - একটু ২ বৃষ্টি পড়িতেছে - গরু দুটা হন্ ২ করিয়া চলিয়া এটা ছকড়া গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল... গাড়িখানা বাতাসে দোলে - ঘোড়া দুটো বেটে ঘোড়ার বাবা - পক্ষিরাজের বংশ - টংয়স - ২ ডংয়স - ২ করিয়া চলিতেছে - পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনোক্রমেই চাল বেগরোয় না।"

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। সপ্তদশ শতকে রচিত একটি উপন্যাসধর্মী গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ John Bunyan-এর 'The Pilgrim's Progress'।

মন্তব্য

২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি উপন্যাসের নক্‌শার উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস'।

৩। 'আলালের ঘরের দুলাল' কে কত সালে রচনা করেন?

উত্তর ঃ প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৮ সালে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন।

৪। আধুনিক উপন্যাস শিল্প গঠনে মৌলিক উপাদানগুলি কী কী?

উত্তর ঃ ১) কাহিনি, ২) চরিত্র, ৩) স্থানীয় পরিবেশ, ৪) সংলাপ, ৫) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, ৬) ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন।

৫। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটি কে কবে রচনা করেন?

উত্তর ঃ ১৮৫২ সালে হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্স 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটি রচনা করেন।

১১.২। কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২) রচনার মধ্যে কেউ কেউ খাঁটি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার নাগরিক সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রদুষ্টি, নানা কদাচার ইত্যাদি কুৎসিত দৃশ্য হুতোমের নক্‌শায় এমন জীবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অদ্ভূত সাহিত্যরস এখনো প্রশংসা দাবি করতে পারে। কিন্তু আঙ্গিকের বিচারে এটিকে কোনোমতেই উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এই গ্রন্থেও কয়েকটি খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষারীতি লক্ষণীয়। ''অমাবস্যার রাত্তির- অন্ধকার ঘুরঘুট্টি - গুড়গুড় করে মেঘ ডাকচে - থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে- গাছের পাতাটি নড়চে না- মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছে - পথিকেরা একএকবার আকাশের পানে চাচ্চেন আর হন্‌হন্‌ করে চলেছেন - কুকুর গুলো ঘেউঘেউ করে - দোকানিরা ঝাঁপতারা বন্ধ করে যাবার উজ্জুগ করে - গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যাল।''

ভূদেবের বিচারসম আস্থাশীল জীবনবোধ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর),

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা) প্রমুখের বিচার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কষাই কর্কশক্ষোভ ক্রমপরিণত হয়ে বঙ্কিমের হাতে অখণ্ড উপন্যাসকলার জন্ম সম্ভাবিত করেছে। এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপ প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর যাদুস্পর্শে। তাই বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের লেখনীর মুখে রোমান্স ও উপন্যাস সার্থক শিল্পরূপ লাভ করেছিল।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কে কত সালে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রচনা করেন?

উত্তর ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬২ সালে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা রচনা করেন।

২। বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা কে?

উত্তর ঃ বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১.৩। রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন পণ্ডিত ও মননশীল ব্যক্তি। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষে নয়, বহির্বিশ্বেও তাঁর খ্যাতি প্রসারিত ছিল। তাঁর বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল। ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অসংখ্য লেখা সুধীজনের সমাদর লাভ করেছিল। রমেশচন্দ্র আগে ইংরেজিতে লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলায় লিখতে উৎসাহিত করেন। সাহিত্যানুরাগী রমেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিপুল খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হন। রমেশচন্দ্র দুটি সামাজিক উপন্যাস ও চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, যার মধ্যে লেখকের শিল্পীসত্তার পরিচয় মেলে। তিনি ঋক্‌বেদের অনুবাদ করেন। দুখণ্ডে হিন্দুশাস্ত্র সংকলন করেন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 'Literature of Bengal' অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস হল 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কন', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৮৯)। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীও সম্ভবত তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'। আকবরের সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে লেখা। আকবরের বিশিষ্ট অমাত্য টোডরমল্ল

মন্তব্য

এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। বাংলা শাসনকর্তা টোডরমল্ল অনুগামী যুবক ইন্দ্রনাথের সাহস ও পরাক্রম উপন্যাসে প্রধান স্থান অধিকার করে। ইন্দ্রনাথ ও সরলার প্রণয়াত্মক উপাখ্যান মূল কাহিনিকে তুষ্ট করেছে। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি।

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭) শাজাহানের সময়কালের ঘটনা। পটভূমি ঐতিহাসিক হলেও পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবন এতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। জমিদারপুত্র নরেন্দ্রনাথ চক্রান্তের ফলে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে ভালোবাসতো হেমলতাকে, যার হাতে সে পরিয়ে দিয়েছিল মাধবীলতা কঙ্কন। এরপরে নরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ে। বহুদিন পরে দেশে ফেরার পরে সে জানতে পারে, যে হেমলতা তার হৃদয়ের প্রধান সম্পদ ছিল, বিবাহ হওয়ার জন্য সে হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। হেমলতা নরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে দেয় মাধবীকঙ্কন। 'মাধবীকঙ্কন'-এর ইতিহাস নিষ্ঠাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। ইতিহাসের গৌরবময় বীরত্বপূর্ণ চিত্র রয়েছে উপন্যাসে। নরেন্দ্র-হেমলতার বিষাদময় অন্তর্গূঢ় প্রেমের পরিচয় উপন্যাসে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''মাধবীকঙ্কন একেবারে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের রচনা।''

'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) উপন্যাসটি রমেশচন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মারাঠাবীর, শিবাজী এবং শিবাজীর নেতৃত্বে যে মহারাষ্ট্র জাতীয় জীবনে নতুন প্রভাতের সূচনা হয়েছিল উপন্যাসে তা পঠিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষের দিকে সৈনিকদের আহ্বান প্রসঙ্গে শিবাজীর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য-

'মহারাষ্ট্র গণ! অদ্য আমাদের জীবন প্রভা'।

উপন্যাসে ইতিহাস যথার্থ রক্ষিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরঙ্গজেবের তুলনায় রমেশচন্দ্রের ঔরঙ্গজেব স্বাভাবিক হয়েছে। ইতিহাসের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, উত্তেজনা-উন্মাদনার মধ্যে রঘুনাথ-সরযুর প্রণয়কথা স্মরণীয় ও স্নিগ্ধ মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়। লেখকের স্বদেশচেতনা সুন্দর আবেগময় রূপ পেয়েছে।

'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৮৯) উপন্যাসে মোঘলসম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে কীভাবে শক্তিশালী মোঘলের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির প্রবল ও দুর্গম সংগ্রাম

সত্ত্বেও তাদের জীবনে কী ভয়াল অন্ধকার নেমে এল সেই করুণ বিষাদ কথাই বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাণা প্রতাপ, যাঁর সঙ্গে রাজপুত বীররা থাকলেও বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমরসিংহ পরাজিত হয়েও মোঘলদের অধীনতা স্বীকার না করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ইতিহাসের জটিল, সংঘাত সংকুল পরিবেশে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর প্রণয় এনেছে অন্য স্বাদ। ড. সুকুমার সেন বলেছেন ''জীবনসন্ধ্যায় কল্পনার অপেক্ষা ইতিহাসের পরিমাণ বেশি। ঘটনার বাহুল্য এবং বর্ণনার দ্রুতগতি কাহিনীকে ব্যাহত করেছে। চারণীর ভূমিকায় স্কটের প্রভাব অনুভূত হয়।''

১৮৮৬ তে 'সংসার' রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। সাধারণ গ্রামবাংলার সমাজজীবনের চিত্রঅঙ্কনে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দাম্পত্য প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় নিবিড় হৃদয়সম্পর্কই যে সংসারে শান্তি আনে সেকথাই এ উপন্যাসে প্রতিপাদিত হয়েছে। সংস্কারবিমুখ, যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশচন্দ্র বিধবাবিবাহের জন্য যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তাকে সমর্থন করেন। এই উপন্যাসও সেই সমর্থনের বাস্তবরূপ লাভ করেছে।

'সমাজ' (১৮৯৪) রমেশচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন লেখক এবং সেই বিবাহ নিষ্পন্ন করেছেন। তাই লেখক যেন জোর করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করেছেন। ফলে উপন্যাসের অনেকক্ষেত্রেই শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবুও বাস্তবচিত্রণ, আদর্শনিষ্ঠা, সত্যের অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং সামাজিক কল্যাণকর্মের আকর্ষণ রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, তিনি বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন না। জীবনের অঙ্গস্পর্শী গভীরতা, দুর্জ্ঞেয়রহস্যময়তা বা পরম উপলব্ধির অনুভব বঙ্কিচন্দ্রের মতো হয়তো তাঁর ছিল না; কিন্তু সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সমন্বিত সাধারণ জীবনের বর্ণনা পল্লী অঞ্চলের সহজ অকৃত্রিম চিত্রণে এই সরল সত্যনিষ্ঠায় তিনি অনন্য মহিমায় বিরাজিত।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কী কী?

উত্তর ঃ 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কন', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'।

২। রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'বঙ্গবিজেতা'।

৩। রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত।

৪। রমশেচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'সংসার'।

৫। রমেশচন্দ্র দত্তের শেষ উপন্যাস কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'সমাজ'।

১১.৪। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে আবির্ভূত হয়েও আপন স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতায় যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা বঙ্কিম সাহিত্য থেকে স্পর্ধিত ব্যতিক্রম রূপেই দেখা দিয়েছে। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতায়, ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ বাঙালি জীবনের সান্নিধ্যে প্রাণের সঞ্জীবিত ধারায় যে সহজ অথচ চিরায়ত সত্যের প্রকাশ সেই বাস্তবধর্মী জীবনজাত সাহিত্যরচনাতেই তাঁর আগ্রহ এবং এ বিষয়ে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তারকনাথ ছিলেন সরকারি চিকিৎসক, কার্যাপলক্ষে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। সরকাবি কার্যে গ্রাম-গ্রামান্তরে গরুর গাড়িতে পর্যটনরত তিনি পথিমধ্যে বিশ্রামকালে গরুর গাড়ির তলায় শতরঞ্চে বসে সাহিত্য রচনা করতেন। গ্রামীণ পটভূমি পরিবেশ, নিত্য দেখা চরিত্র, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস ও অন্যান্য রচনাকে বাস্তবজীবন্ত ও মর্মস্পর্শী করেছে। 'স্বর্ণলতা' ('জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশ, ১৮৭২/৭৩ সালে; গ্রন্থরূপে প্রকাশ ১৮৭৪) উপন্যাস তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এছাড়া তিনি দুটি উপন্যাস

লিখেছেন - 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭) যাতে গ্রাম্য চক্রান্ত ও দলাদলির ছবি ফুটে উঠেছে। 'অদৃষ্ট' (১৮৯২) তে সাংসারিক জটিলতার চিত্র এবং 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯)।

'পঞ্চচত্বারিংশত' (৪৫) পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'স্বর্ণলতা'য় কুটিল, ষড়যন্ত্রময়, পারিবারিক জীবনের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দুই ভাই শশিভূষণ ও বিধুভূষণ একান্ন হলেও বড়ো ভাইয়ের কুটিলা স্ত্রী প্রমদার পরামর্শে সে ভাগ্যহীন ভাইকে পৃথক করে স্ত্রী সরলা ও পুত্র গোপালকে নিয়ে আতান্তরে পড়ে। বিধুভূষণ ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় যায়, এক যাত্রাদলে বাজনাদারের কাজ পায় ও সরলাকে টাকা পাঠায়। কিন্তু সরলা তা পায় না। প্রমদার ভাই দুষ্ট পুলিশ রমেশের সাহায্যে গোপালের সই জাল করে সেই টাকা আত্মসাৎ করে। বিধুভূষণ ফিরলে আনন্দের অতিশয্যে অসুস্থ সরলা মারা গেল। জালিয়াতি ধরা পড়ায় গদাধরের কারাবাস হয় এবং পরে রমেশও শাস্তি পায়। গোপাল লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় যায় ও ধনী পরিবারের কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে পরিচিত হয়। এদিকে শশিভূষণ বিপদাপন্ন হলে তাকে পরিত্যাগ করে প্রমদা সমস্ত অর্থ ও অলংকার নিয়ে নৌকায় পালাবার কালে সব জিনিস জলে ডুবে যায়। গোপালের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ে হয়, সকলে সুখী হয়। এই উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনার অলৌকিক বিস্ময় এখানে নেই। ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতীত ইতিহাসের অপরূপ উন্মোচনও এখানে পাওয়া যায় না। জীবনের রহস্যময় দর্জ্ঞেয়তাও স্বর্ণলতার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তুচ্ছ সামান্য দৈনন্দিন বাঙালি জীবনের বর্ণহীন, মেদুর বাস্তবচিত্র এখানে গভীর আন্তরিকতায় চিত্রিত হয়েছে। কল্পলোক থেকে লেখক আমাদের দৃষ্টিকে প্রাত্যহিক ধূলিমলিন ক্ষুদ্র তুচ্ছতায় অবনমিত করেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তব। যেন বাংলার জীবনের নিত্যকার দেখা মানুষগুলো তাদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, যন্ত্রণা-উল্লাস নিয়ে নিখুঁত পরিপূর্ণ রূপে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। সরলার সহজ-সরল হৃদয়ধর্ম, প্রমাদর কুটিলতা, রমেশের চক্রান্ত, গদাধরচন্দ্রের নির্বোধ শয়তানী ভোলা যায় না। 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা' ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। গদাধর চরিত্রে দানীবাবুর (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) অভিনয় অসাধারণ হয়েছিল। কাহিনিতে গদাধরের উক্তি, দানীবাবুর অভিনয় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। যেমন- ''গডাধর চণ্ড্র! গডাধর চণ্ড্র এইবার মোলো''।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলির নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'স্বর্ণলতা', 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট'।

২। 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ কী?

উত্তর ঃ 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা'।

৩। গদাধর চরিত্রে কে অভিনয় করেছিলেন?

উত্তর ঃ দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)।

১১.৫। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত হয়ে রইলেন 'ভারত উদ্ধার' ব্যাঙ্গাত্মক কাব্যের জন্য। তিনি পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামে বেশ কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক গদ্য ও পদ্য রচনা করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়েও তাঁর কৌতুক ব্যঙ্গকে তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। 'কল্পতরু' (১৮৭৪) সম্ভবত বাংলার প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের নরনারীদের আক্রমণ করা হয়েছে এই উপন্যাসে। ব্রাহ্মসমাজ প্রগতিশীল এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাদর্শে প্রচলনে সচেষ্ট হলেও সেযুগের সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাঁকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি এবং অকারণ বিদ্বেষবশত ব্রাহ্মদের আঘাত করেছে। এছাড়া তদানীন্তন সমাজজীবনের অনাচার ও মানবচরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি অসংগতির চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'কল্পতরু'র বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

'ক্ষুদিরাম' (১৮৮৭) উপন্যাসধর্মী রচনা। কয়েকটি কাহিনীর শিথিল গ্রন্থনের দ্বারা সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কনে লেখক তৎপর। এখানেও লেখকের আক্রমণের লক্ষ্য ব্রাহ্মসমাজ। বিশেষত শিক্ষা ও স্বাধীনতার নামে নারীদের কার্যবিধি লেখকের বিরাগ উৎপন্ন করেছে। তিনি তাদের আঘাত করেছেন। আক্রমণ কখনো হয়েছে তিক্ত ও নির্মম। অবশ্য 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' কার ইন্দ্রনাথের হাসির অন্তরালে তাঁর প্রবল সমাজসচেতনতা ও গভীর রসানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী?

উত্তর ঃ পাঁচু ঠাকুর।

২। বাংলার প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'কল্পতরু' (১৮৭৪) বাংলার প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস।

৩। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনায় কাকে আক্রমণ করেছেন?

উত্তর ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনায় ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করেছেন।

১১.৬। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজরূপে পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা কম ছিল না। তাঁর 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭) উপন্যাসরূপে বিশিষ্ট। এর আগে লেখা 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং 'দামিনী' শিল্পময় ছোট গল্প। তাঁর 'পালামৌ' (বঙ্গদর্শন ১২৮৭-৮৯) সুন্দর মনোরম ভ্রমণকাহিনী। সঞ্জীবচন্দ্র 'যাত্রা সমালোচনা', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি সাহিত্যসমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার গুণপনা থাকলেও তাঁর সম্পূর্ণ চর্চা তিনি করেননি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, ''সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিনীপনা ছিল না।''

'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্র চট্টেপাধ্যায়ের লেখা ভ্রমণ-কাহিনি। লেখাটি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনি। ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবনের সুন্দর বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। লেখকের প্রকৃতিচেতনা আন্তরিক, পর্যবেক্ষণী শক্তি নিখুঁত ও সৌন্দর্যবোধ গভীর। আর আছে তাঁর সরস কৌতুকস্নিগ্ধ মন, যা প্রতিটি বিষয়কে রসসিদ্ধ হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। সঞ্জীবচন্দ্র আরো লিখেছেন কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি খুব মগ্ন বা নিবিষ্ট ছিলেন না। তাঁর বিভিন্ন লেখা কথামালার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত। রবীন্দ্রনাথ বলেচেন যে, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নয়। সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির বদলে পাঠক চিত্তে রসের প্রকৃতি সঞ্চার করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' গ্রন্থে কোল নারীদের

মন্তব্য

নাচের বর্ণনা দিয়েছেন। নৃতত্ত্বে যেমন করে বিবরণ লেখা হয়, এ তেমন নয়। লেখক ইচ্ছে করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। তাই লেখায় ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌঁছেছে। অথচ বিশেষ কোনো ছন্দের কাঠামো নেই। আরো উল্লেখ্য এই যে, 'পালামৌ'-এর কোনো কোনো উক্তি বাংলায় স্মরণযোগ্য বাক্যে বা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। যেমন - ''বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'', ''মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না'', ''অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে'' ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ভ্রমণকাহিনি কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত ভ্রমণকাহিনি।

২। সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ কী কী?

উত্তর ঃ 'যাত্রা সমালোচনা', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি।

১১.৭। সীতাদেবী ও শান্তা দেবী

স্ত্রী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সীতা ও শান্তাদেবীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এঁদের উপন্যাসে বিশেষ করে নারী সমাজের আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কারে নানামুখী আলোড়ন কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, নারীর ভাবগভীরতার মধ্যে এই পরিবর্তনের তরঙ্গচাঞ্চল্য কতখানি স্থির ও সংগত হয়েছে এই কাহিনির ইতিহাসই এঁদের উপন্যাসের প্রধান বিষয়। নারী মনের ঢেউ বৈঠকখানা ভাসিয়ে নিয়ে তা অন্দরমহলের প্রাচীন বেষ্টনী হতে প্রতিহত হয়ে ফিরেছে। পরিচয়ের দ্বারা প্রথম সংকোচ কাটিয়ে উঠে নারী তার নিজের বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবোধকে ধীরে ধীরে বিকাশ করেছে। জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় নারী আজ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহচর ও প্রতিদ্বন্দ্বী। অভাবের প্রবল তাড়না আজ তার সুকুমার লালিত্যের অপচয় করে তার কার্যকরী বিকাশের সহায়তা করেছে। এই কঠোর জীবনসংগ্রামে ধূলিধূসর প্রণয়ের চিত্রই সীতা ও শান্তাদেবীর উপন্যাসসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এঁদের নায়িকারা প্রায়ই

গরীবের মেয়ে, স্কুলের ছাত্রী ও বড়লোকের গৃহের শিক্ষয়িত্রী। অভাবের আঁচ এঁদের শরীর, মনের সরলতাকে অনেকখানি ঝলসিয়ে দিয়েছে। তাদের দেহসৌন্দর্য্যের কোনো অহঙ্কার নেই। স্বভাব-মাধুর্য ও ব্যবহারে সুরুচিপূর্ণ ভদ্রতাই তাদের একমাত্র আকর্ষণ। তারা পুরুষের প্রণয়াভিব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে না। প্রণয়লোভের তীব্র আকঙ্খা পুরুষের দিক থেকে সাড়া না পেয়ে ব্যর্থ ক্ষোভ হৃদয়ের মধ্যে গুমরিয়ে মরে। শেষপর্যন্ত যখন তাদের প্রেমস্বপ্ন সফলতা লাভ করে তখন তাদের আত্মসমর্পনের কোনো উচ্ছাস থাকে না। একটা শান্ত, সংযত আনন্দের পূর্ণতা তাদেরকে নিশ্চল আত্মসমাহিত রাখে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনায় তারা পুরুষের সাথে সমকক্ষ হিসাবে সমান আসন দাবি করেন। তাদের আলোচনার বিশেষ ভঙ্গি তাদের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য এই তর্কযুদ্ধে প্রতিফলিত হয় ও একে নতুন খাতে সঞ্চারিত করে। মোটকথা এঁদের উপন্যাস স্ত্রী-পুরুষের জন্য আমাদের সামাজিক জীবনে যে একটা নূতন সমন্বয়ক্ষেত্র রচিত হচ্ছে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তাদের কথোপকথন, তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে একটা সুরুচি, ভদ্রতা, হাস্য-পরিহাস ও শ্রদ্ধার আদর্শ গড়ে উঠেছে তা অনুভব করা যায়। এই সামাজিক ইতিহাস পরিবর্তনে বিবৃতি বলে এঁদের উপন্যাস গুলির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে।

সীতা ও শান্তাদেবীর উপন্যাসবলী আলোচনা করলে এদের বিষয়বস্তু, ভাষা ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্তব্য এতই অভিন্ন যে এঁদের পরস্পরের সাথে তুলনায় বিশেষত্ব নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরুহ। সীতাদেবীর রচনার মধ্যে অনেকগুলি ছোটগল্পের সমষ্টি ও কতগুলি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আছে। 'বজ্রমণি', 'ছায়াবীথি', 'আলোর আড়াল' এগুলির ছোটগল্প। 'পথিকবন্ধু', 'রজনীগন্ধা', 'পরভূতিকা', 'বন্যা'- এই কটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ছোটগল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই সামাজিক বৈষম্য ও অসংগতিমূলক। কতকগুলি বিষয় রোমান্টিক ও ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আলোর আড়াল', 'ভ্রষ্টতারা' নামক দুটি গল্প এই সমষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মধ্যে 'পরভূতিকা' উৎকর্ষের দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করে। এই গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ হয়েছে। মেয়ে স্কুল ও বোর্ডিংয়ের স্নেহহীন আবেষ্টনের রুক্ষ, কঠোর প্রতিবেশ কৃষ্ণার চরিত্রের স্বাভাবিক

মন্তব্য

মাধুর্য থেকে আরো প্রকাশ করেছে। 'পথিবন্ধু' উপন্যাসটি রচনাকালের দিক থেকে অগ্রবর্তী হলেও উৎকর্ষের দিক দিয়ে 'পরভূতিকা' অপেক্ষা প্রশংসনীয়। 'পরভূতিকা'তে ঘটনাবৈচিত্র্যের আধিক্য উপন্যাসোচিত রসবিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পথিকবন্ধু'তেও ভ্রমণকাহিনির উপভোগ্য রসের অভাব নেই। কিন্তু এই ভ্রমণবৃন্তান্ত ও প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলির ভাবপরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

'বন্যা' উপন্যাসটি একটি সামাজিক অসংগতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপর্ণা বা সুবর্ণার মতো তার পিতা অতুলচন্দ্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও তার সুস্পষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ক্রুর প্রকৃতির পরিবারে তার বিবাহ দিয়েছিল। এই বিবাহের ফল মোটেও শুভ হয়নি। শেষপর্যন্ত মৃত্যু শয্যাশায়িনী মাকে দেখতে আসার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির দ্বার তার নিকট চিররুদ্ধ হয়ে গেছে। সুপর্ণার লজ্জাকুণ্ঠিত অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ হতে স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল মহিলাতে পরিবর্তন 'বন্যা' উপন্যাসটির প্রধান বিষয়। এই পরিবর্তনের চিত্র খুব সাধারণ। এর মধ্যে কোনো গভীর মনস্তত্বমূলক আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

'রজনীগন্ধা' (ফাল্গুন ১৩২৮) লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্ত্রীজাতির পক্ষ থেকে তাদের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করবার জন্য উপন্যাস লিখলেও কীরূপ নূতন আর্টের সৃষ্টি হতে পারে 'রজনীগন্ধা' তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। কণিকা, মেনকা, লালু তিনটি ভাইবোনেরই চরিত্রবৈশিষ্ট্য অতি চমৎকৃতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। পরিবারের পুরুষকর্তৃত্ব নিতান্ত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়েছে। কণিকার বাবা চিররুগ্ন ও অকর্মণ্য। তার দাদা প্রবোধ স্বার্থপর, কর্তব্যজ্ঞানহীন। নারী হৃদয়ের স্বচ্ছ, শীতল, শান্ত প্রবাহ যে পুরুষ চরিত্রে একটা সরস শ্যামল প্রভাব ফেলেছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবসর নেই। নারীর দিক থেকে প্রেমের তীব্র অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবে এরূপ বিবরণ বাংলা উপন্যাসে বিরল এবং এটাই উপন্যাসটির গৌরবময় বিশেষত্ব।

'উদ্যানলতা' উপন্যাসটি সীতা ও শান্তা দেবীর যুগ্ম রচনা। এঁদের লিখনভঙ্গির অভিন্নতা চমৎকার সাক্ষর দেয়। এঁদের মধ্যে কোন্ অংশ কার রচনা তা নিতান্ত সূক্ষ্ম আলোচনার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এঁদের বর্ণনাভঙ্গি, জীবন সমালোচনার ধারা, চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব আশ্চর্যভাবে মিশে গেছে। উপন্যাসটির মধ্যে কিন্তু গভীরতার একান্ত অভাব।

মুক্তির জীবনের যে বিস্তৃতিমূলক দিনলিপিমূলক কাহিনি দেওয়া হয়েছে তাতে তার উপরিভাগের ঔজল্য লঘু, চটুল, হাস্যপরিহাস, চঞ্চলপ্রবাহ, ঠাকুরমার সঙ্গে (ক্ষুদ্র) সংঘর্ষ ও পিতার অপরিমিত স্নেহাদরে অবধ স্বাধীনতার আস্বাদ- এইসমস্ত দিকই চমৎকার ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হলেও গভীরতার দিক থেকে মোটেই সংবদ্ধ নয়। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর যুগ্ম রচনা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'উদ্যানলতা'।

২। সীতাদেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'রজনীগন্ধা'।

১১.৮। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম উদ্ভট কল্পনা সম্বলিত ও ভৌতিক ও মানবিক ঘটনার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনির প্রবর্তনের কৃতিত্ব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। ব্যক্তিগত যন্ত্রণাতিক্ত জীবনসংগ্রামে হতোদ্দ্যম হননি ত্রৈলোক্যনাথ। ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রত্যন্তে বিচরণ এবং একাধিকবার পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক উদার প্রসন্ন ব্যাপ্তি। ফলে তাঁর রসরচনা কখনো তীব্র-তির্যক হয়নি, সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এক স্মিত প্রসন্ন কৌতুক। তাঁর রচনার মধ্যে 'কঙ্কাবতী' (১২৯২), 'মুক্তমালা (১৯০১), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনার সংমিশ্রণে ত্রৈলোক্যনাথ যে বেপরোয়া, অকুতোভয় মনোভাব দেখিয়েছেন - সেখানেই তাঁর বিশেষত্ব নিহিত। অনৈসর্গিক বিষয়ের অবতারণায় তিনি যেরকম অজস্র উদ্ভাবন শক্তি ও অকুণ্ঠিত কল্পনাক্রীড়ার পরিচয় দিয়েছেন - তা এই মনস্তত্ব সমর্থিত বিশ্বাস উৎপাদনের যুগে অনন্য সাধারণ।

কঙ্কাবতী ঃ-

১২৯২ বঙ্গাব্দে রূপকথার ছাঁচে বিশুদ্ধ সাহিত্য রস সৃষ্টি করা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। কল্পনাশক্তি, সমবেদনা, মাত্রাজ্ঞান এবং সরলতা - এই কটি গুণের সমাবেশ না

মন্তব্য

হলে কাহিনিতে অদ্ভূত কৌতুকরস মিশ্রিত হয় না এবং রূপকথার যথার্থ স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। এই কটি দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটেছে 'কঙ্কাবতী'তে। এটি বাংলা সাহিত্যের এমন একটি খুলে দিয়েছিল - যেদিকে আমাদের সাহিত্যরথিদের বিশেষ অনাগোনা ছিল না। ছেলেভুলানো ছড়ায় প্রাপ্ত 'কঙ্কাবতী'র ভগ্নাংশ কাহিনিকে অবলম্বন করে এবং লুইস্ ক্যারলের 'Alice in the Wonderland'-এর আদর্শ কতকটা অনুসরণ করে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অভিনব উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। লেখকের সকৌতুক স্নিগ্ধ কটাক্ষে সঞ্জীবিত মানুষ, পশু, ভূত, প্রেতিনী সকলে সম্ভব অসম্ভবের রাজ্যে অবিরোধে পরস্পরের পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছে। উদ্ভট কল্পনাকে আশ্রয় করে এমন নতুন অদ্ভূত রস সৃষ্টি সবদেশের সাহিত্যেই বিরল।

'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম রচনা হলেও রচনা ভঙ্গিতে কোনো জড়ত্ব নেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ''লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণার উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।'' কাহিনির মধ্যে মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু সে ব্যঙ্গে কোনো কন্টক বা জ্বাল নেই। এর প্রথম খণ্ড গার্হস্থ্যজীবনমূলক এবং দ্বিতীয় খণ্ড অবাস্তব কল্পনাশ্রিত। তবে শেষপর্যন্ত 'কঙ্কাবতী'র জড়বিকারের সঙ্গে তার অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে সম্পৃক্ত করে বাস্তব মনস্তত্ত্বের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই অংশটিতে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন - ''উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।... এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে 'এলিস ইন্ দি ওয়ানডারল্যাণ্ড' নামক একটি গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই।''

ত্রৈলোক্যনাথের রচনারীতি একেবারেই নিজস্ব স্টাইলে পূর্ণ। লেখ্যভাষাকে কথ্যভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিতে অল্প লেখকই পেরেছেন। প্রাজ্ঞ সমালোকে ভূদেব চৌধুরীর মতে, গল্প লিখলেও আসলে শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন গল্পের কথক - লেখনীর মুখ দিয়ে তিনি গল্প বলেছেন। আর যেকোনো আদর্শ গল্প বলিয়ের মতোই

কাহিনির সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়েছেন। মন্তব্য

উপন্যাস, উপাখ্যান বা অন্য যা কিছু হোক - একালের পাঠকের কাছ দাবী কাহিনির বাস্তবতা। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সব লেখাতেই কাহিনির বাস্তবরস পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি। এই বাস্তবতাকে যে তিনি শিল্পজগতে ব্যবহারে সমর্থ ছিলেন তার দৃষ্টান্ত 'কঙ্কাবতী'র প্রথম খণ্ড। কিন্তু তাকেও তিনি 'উপকথার উপন্যাস' বলে পরিচিত করেছেন এবং সাহিত্যিক নিয়ম লঙ্ঘন করেও বাস্তবতা ধর্মী কাহিনিকে টেনে নিয়ে গেছেন উপকথার পথে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ত্রৈলোক্যনাথের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ 'কঙ্কাবতী' (১২৯২); 'মুক্তমালা' (১৯০১); 'ডমরুচরিত' (১৯২৩)।

২। ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম রচনা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ 'কঙ্কাবতী'।

১১.৯। স্বর্ণকুমারী দেবী

বঙ্কিম উত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। মহর্ষীর তিনি চতুর্থ কন্যা, রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন ''বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ভালো লেখিকা''। তাঁর উপন্যাসগুলিকে প্রধানত ঐতিহাসিক ও সামাজিক - এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস - 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'বিদ্রোহ' (১৮৯৪)। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায় স্বর্ণকুমারী বঙ্কিচন্দ্রের অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমের মতো কল্পনার প্রসারতা ও তিব্র উচ্ছ্বাসেরপরিবর্তে রমেশচন্দ্রের মতো সত্যনিষ্ঠা ও থ্যানুবর্তনের প্রতি আগ্রহই তাঁর বেশি। তাঁর উপন্যাসের ভাষা, মন্তব্য, সারবত্তা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য।

মন্তব্য

দীপনির্বাণ ঃ-

অতি অল্পবয়সের রচনা। ফলে কিছু অপরিপক্কতার পরিচয় আছে। চিতোর রাজের পারিবারিক ইতিহাস ও মহম্মদ ঘোরীর দিল্লি আক্রমণ - এই দুই ঐতিহাসিক কাহিনিধারা উপন্যাসের মধ্যে মিলিত হয়েছে। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে হিন্দু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোনো পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এতে পাওয়া যায় না। উপন্যাসে দুটি প্রেমকাহিনি বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলি রসোজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসে কাহিনির মধ্যে প্রভাবতী ও শৈলবালার সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ রূপ চিত্রিত হয়েছে। থানেশ্বরের যুদ্ধ বর্ণনায় লেখিকার বর্ণনা কৌশল প্রশংসাযোগ্য।

১। উপন্যাসে উল্লিখিত সমর সিংহ, কিরণ সিংহ, কল্যাণ, পৃথ্বীরাজ, চাঁদ কবি (কবীচন্দ্র)- ঐতিহাসিক ব্যক্তি তবে সমর সিংহ যে ছিলেন পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি সেটি 'দীপনির্বাণ'- উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত আত্মীয়তার সূত্রে নয় - দেশমাতৃকার সেবার জন্যই যে সমর সিংহের যুদ্ধযাত্রা - এইটি দেখানোই স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য ছিল।

২। এই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে ঘটনার ভিড় অত্যন্ত বেশি। প্রত্যেকটি ঘটনার উপর লেখিকা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি। এই মাত্রাবোধের অভাব থাকায় উপন্যাসটির কাহিনি শিথিল বিন্যস্ত।

৩। দুটি নারীর চপলতা, ছদ্ম অভিমান, সখীত্বের আন্তরিকতা; কয়েকটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের মধ্যে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। ইতিহাসের রাজকীয় সমারোহের মধ্যে এই পরিচিত বাস্তবতার স্পর্শ পেয়ে পাঠক অনেকটা স্বস্তিবোধ করে।

৪। এই উপন্যাসে কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও এতে লেখিকার যে আন্তরিক স্বদেশ প্রেরণা প্রকাশিত হয়েছে তার মহত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ফুলের মালা ঃ-

পটভূমি বাংলাদেশে পাঠান রাজত্বের সময়, যখন সেকেন্দর শাহ্ দিল্লির অধীনতা কার্যত ত্যাগ করে বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। একদিকে দিনাজপুরের রাজবংশের সঙ্গে বঙ্গেশ্বরের, অন্যদিকে বঙ্গ রাপরিবারের মধ্যে পিতাপুত্রের

বিরোধ উপন্যাসটির প্রধান বিষয়বস্তু। যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনায় তথ্যসন্নিবেশের প্রয়াস আছে। চরিত্রগুলির মধ্যে শক্তির দৃপ্ত অভিমান ও তেজস্বীতা, গণেশ দেবের রোমান্স নায়কের লক্ষণযুক্ত বৈশিষ্ট্য। যোগিনীর অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি একত্রিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এটি 'দীপনির্বাণ' অপেক্ষা উন্নত।

এই স্বর্ণকুমারী দেবীর শে, ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'ফুলের মালা' তে লেখিকা সার্থকতায় পৌঁছেছিলেন। কাহিনির ভৌগলিক পরিবেশ বাংলাদেশ, সময় রাজা গণেশের আমল। গিয়াসুদ্দিনের সময় রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ এই উপন্যাসের বিষয়। অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের সঙ্গে স্টায়ার্টের 'History of Bengal' যে স্বর্ণকুমারীর অন্যতম অবলম্বন ছিল- সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপন্যাসটির প্রধান বিষয় রাজা গণেশদেবের চরিত্রচিত্রণ। লেখিকা গণেশ দেবকে কেবল আদর্শ বীর রূপেই দেখাতে চাননি, বরং সকল ধর্মে সমদর্শী আদর্শ প্রজাপালক রূপেও দেখাতে চেয়েছিলেন। গণেশ দেবের সহায় ছিলেন সন্ন্যাসিনী যিনি নিবৃত্তি মার্গের পথিক এবং পুণ্যের দ্বারা পুন্য অর্জন যাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। গণেশ দেবের উদ্দেশ্যও তাই ছিল। সেজন্য শক্তিময়ীর প্রতি আদর্শ থাকা সত্ত্বেও তিনি বারবার নিষ্ঠুর সমাজশাসনকে মেনে নিয়েছেন। কূটনীতি অপেক্ষা ন্যায়ধর্ম বড়ো- রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বাণী গণেশদেবকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভাবিত করেছে দেখা যায়। অবশ্য সামগ্রিক বিচারে গণেশদেবের চরিত্র অপরিস্ফুট ও রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত।

মিবাররাজ ও বিদ্রোহ ঃ-

রাজপুত ইতিহাসের কাহিনি- ভিল ও রাজপুতের জাতিগত বিরোধের বিবরণ। 'মিবাররাজ'-এ পার্বত্য ভিল জাতির একদিকে রাজভক্তি ও সরল বিশ্বাস প্রবণতা, অপরদিকে চিরাচরিত প্রথার প্রতি অবিচল আনুগত্য ও বংশগত টবর নির্যাতন প্রবণতার চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাসটি আয়তনে ক্ষুদ্র ও বর্ণিত ঘটনা বিন্যাসও স্বল্পাবয়ব। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি ২০০ বৎসরের পরবর্তী ঘটনার বিবৃতি। এতে ভিল ও রাজপুতের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা খুব সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত। এই ২০০ বছরের মধ্যে ভিলের জন্মভূমি রাজপুতের অধিকারে এসেছে। ভিলরা রাজপুতের বশ্যতা স্বীকার করে কৃষিকর্ম, মেষপালন প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের মধ্যে রাজভক্তি

মন্তব্য

থাকলেও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সুপ্ত অবস্থায় আছে। ভিল ও রাজপুতদের মধ্যে পারস্পরিক জাতিবিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাবটি উপন্যাসের মূল পরিবেশকে উপভোগ্য করে তুলেছে। রাজা ও সিমন্তিনী রানীর ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্য। ভিল যুবক জুমিয়ার প্রতি রাজার সৌহার্দ্য ও জুমিয়ার পালিতা কন্যা সুহারের প্রতি তার আকর্ষণ উপন্যাসকে ক্রমশ জটিল ঘটনাবর্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুহারের (সুহারমতী) পানিপ্রার্থী ভিল যুবকের (ক্ষেতিয়া) ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা ও প্রতিহিংসার ওড়না ভিলদের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রচ্ছন্ন আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলল এবং রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল - ভিলরা রাজপুত রাজ্য ধ্বংস করল।

রাজপুত ও রাজপুতবংশের ভবিষ্যত আসা শিশু বাপ্পারাও সুহারের মাতৃস্নেহশীতল বক্ষে আশ্রয় লাভ করে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের শুভদিন প্রতীক্ষা করতে লাগল। উপন্যাসের ট্রাজেডি এইভাবে অনিবার্য ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভিল ও রাজপুতের পরস্পর সম্বন্ধ, ভিলদের সরল গ্রাম্যজীবন, কুসংস্কারপরায়ণতা ও অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় চিত্র হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। রাজা ও রানীর পারস্পরিক মনোমালিন্যের চিত্রে লেখিকার সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখিকার কবিত্বময় সূক্ষ্ম অনুভূতি নিদর্শন পাওয়া যায় সমালোচকের ভাষায় '' 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত সর্বদা অতুলনীয়, এমনকি কোনো কোনো বিষয়ে - ভাষা, কবিত্বশক্তি, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের দিক দিয়া - রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবি করতে পারি।"

টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' থেকে কাহিনি নেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়েছে ভিলদের বর্ণনা। পদানত এই জাতির মনোভাব বিশ্লেষণ লেখিকার শক্তিসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ভিলজাতি সাহসী, সংগ্রাম তাদের পেশা। কিন্তু ২০০ বছরের পরাধীনতার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অন্ধবিশ্বাস, আনুগত্য পরায়ণতা। স্বর্ণকুমারী সমসাময়িক কালের বেদনার প্রতিচ্ছবি ভিলদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনবর্ণনায় প্রক্ষেপ করেছেন।

ভিলদের জীবনযাত্রা প্রণালী, বিশেষ করে সংলাপের ভাষা সাঁওতাল জীবন ও ভাষা প্রভাবিত। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী এই সাঁওতাল জীবন হয়তো লেখিকার বাস্তবদৃষ্ট।

সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস - 'ছিন্নমুকুল', 'হুগলীর ইমামবাড়ি', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে'।

হুগলীর ইমামবাড়ি (১৮৮৮) ঃ-

মহম্মদ ও মুন্না - ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে অতি মধুর স্নেহসম্পর্কের চিত্রই উপন্যাসে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনার অতি পাদুর্ভাব এবং অতি মানবীয় শক্তির একাধিকবার প্রবর্তন উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি। উপন্যাসটির গ্রন্থনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল। একমাত্র মহম্মদ মহসীনের উন্নত উদার চরিত্রই উপন্যাসের খণ্ডাংশগুলির মধ্যে সৎকিঞ্চিৎ ঐক্যবন্ধনের হেতু হয়েছে।

বইটির প্রকাশ ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৮। এই উপন্যাস থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী নরনারীর দ্বৈত লীলার মধ্যে রাজনীতির চক্রান্তে, রাজ্যশাসনে শাস্ত্র প্রদর্শিত নির্দেশ খুঁজে বেরিয়েছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মত নীতিপ্রবণতা লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে প্রমথনাথ মিত্রের 'মহম্মদের জীবনী' অবলম্বনে। তবে লেখিকা নানান কিংবদন্তী থেকেও কাহিনিসূত্র গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটি মহম্মদ মহসীন-এর জীবনী নয়, বরং তাঁর ধর্মবোধের কয়েকটি দিকমাত্র এখানে দেখানো হয়েছে। আসলে গ্রন্থের মূল বিষয় মুন্না- খান জাহান খাঁ সলেউদ্দীন-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মসীন সকল ঘটনার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র। ভগ্নীর কষ্টে সে ব্যথিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো ব্যাপারে সে লিপ্ত নয়। গ্রন্থটিকে লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করলেও সেটি সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। তবে ১৮ শতাব্দীর পটভূমিকায় খান জাহান খাঁ-এর দরবারে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারীতা, খামখেয়ালীপনা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। ভোলানাথ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র। এ চরিত্র লেখিকা শ্রীকণ্ঠ সিংহের আদর্শ অবলম্বনে করেছিলেন। ভোলানাথের গানগুলির মধ্যে তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে।

মন্তব্য

স্নেহলতা (১৮৯২) ঃ-

জগৎবাবুর পারিবারিক জীবনের একটি চমৎকার চিত্র গ্রন্থারম্ভে আছে। জগৎবাবুর রুক্ষভাষিনী, প্রভুত্বপ্রিয়, ধনগর্বিতা, গৃহিনী, তাঁর আদরের মেয়ে অভিমানীনি টগর, উদার কিন্তু দুর্বলচেতা গৃহস্বামী ও শান্তস্বভাবা, সেবাকুশলা স্নেহলতা - সকলে মিলে এক চমৎকার পারিবারিক চিত্র রচনা করেছে। কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই সমাজ সমালোচনা ও মতবাদ প্রচারের তিব্রতা উপন্যাসের এই সুরটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। স্নেহলতার বৈধ্যবযন্ত্রণা ও অসহায়তার মধ্যে প্রথম খণ্ডে উপসংহার রয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড ও প্রথম খণ্ডের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। এখানে চারু চরিত্রটি উপন্যাসে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চারু ও বিধবা স্নেহলতার পরস্পরের প্রতি প্রেমসঞ্চারই এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কিন্তু তাদের প্রেমবর্ণনার চেয়ে বিধাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যুক্তিমূলক আলোচনাই উপন্যাস মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। চারুর মা টগরের প্রতিকূলতার এই প্রণয় অগ্রসর হতে পারেনি। চারুও তার ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিস্মৃত হয়ে অন্যত্র বিবাহ করে তার চরিত্রের অসাঢ়তা প্রমাণ করেছে। এইভাবে চারিদিকের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে স্নেহলতা আত্মহত্যার দ্বারা সব জ্বলা জুড়িয়েছে। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন বাঙালি সমাজে আধুনিক সমস্যা নিয়ে এই প্রথম উপন্যাস লেখা হলেও উপন্যাসের ঘটনা পারস্পর্যের সঙ্গে কোনো চরিত্র পরিণতির যথাযথ যোগসাধন হয়নি। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ‘‘উপন্যাসের প্রকৃত রস কোথাও জট বাঁধে নাই।’’

কাহাকে (১৮৯৮) ঃ-

সমালোচকদের অভিমত লেখিকার সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস এটি। এক আধুনিক শিক্ষিতা মহিলার প্রেম বিষয়ে বিভিন্ন অনুভূতি এবং শেষপর্যন্ত প্রকৃত প্রেমের পরিচয় লাভের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এই উপন্যাসটির মধ্যে লেখিকার অন্যান্য উপন্যাসের মত যথেষ্ট তর্কবিতর্ক ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ আছে, ইংরেজি সাহিত্য ও সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা আছে। কিন্তু সকলের উপরে ঔপন্যাসিকের নারীসুলভ কোমল সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। এছাড়া উপন্যাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিতে - যেমন পিতার

প্রতি আদরিণী কন্যার মনোভাব বর্ণনায় ও এই মনোভাবে প্রেমের সমস্ত লক্ষণ আবিষ্কার করার মধ্যে, রমানাথের প্রতি নবজাগ্রত প্রেমবিকাশের বিশ্লেষণে, প্রেমভঙ্গের দুঃসহ বেদনা ও ক্লীষ্ট নৈরাশ্যে ও পরিশেষে প্রকৃত প্রণয়ীর সঙ্গে শঙ্কাব্যাকুল অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়ে মিলনের গভীর তৃপ্তিতে- মোটকথা উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারেই ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মতা ও আবেগের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসে নায়িকার চরিত্রটি সযত্নে গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা তাকে বাক্‌সংযম দিয়েছে, তার রুচি মার্জিত করে চরিত্র সৌকুমার্য বাড়িয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে এক নারীর মনোভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব হিসাবে উপন্যাসটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে বলে অনেক সমালোচকই মনে করে থাকেন।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'দীপনির্বাণ', 'ফুলের মালা', 'মিবাররাজ', 'বিদ্রোহ'।

২। স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস কী কী?

উত্তর ঃ 'ছিন্নমুকুল', 'হুগলীর ইমামবাড়ি', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে'।

১১.১০। প্রবন্ধ নিবন্ধ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা ও মননশীলতার আঘাতে মধ্যযুগীয় বাঙালি বিশেষত নাগরিক বাঙালি যেন জন্মান্তরের অকূল-অতল বারিধির তটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

প্রাচীন সংস্কৃত এবং ইউরোপের গ্রীক-রোমান ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা বহু পুরাতন যুগ থেকেই চলে আসছে। রেনেসাঁসের সময়ে যখন দেশভাষার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার কিছু পরে ইউরোপে ছাপাখানার কাজ শুরু হল, তখন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ও বিবাদ-বিতর্ক দেশীয়

মন্তব্য

ভাষাতেই প্রচারিত হয়েছিল।

১১.১১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কৃত্রিম ভাষায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার রচনাভঙ্গি হাস্যকর, বিষয়বস্তুও উল্লেখের অযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধগুলি হল - 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ ১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য়-১৮৯২), 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' (১২৯৫)।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বঙ্কিচন্দ্র লিখিত দুটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'সাম্য' (১৮৭৯)।

১১.১২। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ও অন্যান্য প্রাবন্ধিক

'বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী' নামে যে প্রাবন্ধিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল তার সদস্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য্য)।

বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ

১। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - 'গ্রীক ও হিন্দু' (১৮৭৫), 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬)।

২। যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ - 'ম্যাটসিনি জীবনবৃত্ত' (১৮৮০), 'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০), 'বীর পূজা' (১ম ও ২য়, ১৯০০)।

৩। রামদাস সেন - 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১ম-১৮৭৪, ২য়-১৮৭৬, ৩য়-১৮৭৯), 'ভারত রহস্য' (১৮৮৫)।

৪। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় - 'যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮), 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬৯),

'কাব্যকলাপ' (১৮৭০), 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫)। মন্তব্য

৫। চন্দ্রনাথ বসু - 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'ফুল ও ফল' (১২৯২), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' (১৩০৬)।

৬। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় - 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬), 'সারস্বত কুঞ্জ' (১২৯২), 'স্ত্রী চরিত্র' (১৮৯৭)।

৭। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় - 'সহরচিত্র' (১৯০১), 'সোহাগচিত্রে' (১৯০১)।

৮। কালীপ্রসন্ন ঘোষ - 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৮৪), 'বিভূতচিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬)।

৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী - 'কাঞ্চনমালা', 'বেনের মেয়ে', 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১), 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২)।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী'র কয়েকজন প্রাবন্ধিকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮), 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬৯)।

৩। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের দুটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'সহরচিত্র' (১৯০১), 'সোহাগচিত্র' (১৯০১)।

৪। কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত দুটি প্রবন্ধের নাম লেকো।

মন্তব্য

উত্তর ঃ 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৮৪), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮৩)।

১১.১৩। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ উপন্যাস রচনায় কতটা দক্ষতা দেখিয়েছেন তা আলোচনা করো।

২। উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা নির্দেশ করো।

৩। মহিলা কবি হিসাবে সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৪। বিশ শতকের উপন্যাসের দারায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৫। বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করো।

১১.১৪। সহায়ক গ্রন্থ

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-১২ রবীন্দ্রযুগ

বিন্যাসক্রম

১২.১। রবীন্দ্রযুগ-ভূমিকা

১২.২। কাব্য-কবিতা

১২.৩। নাটক

১২.৪। উপন্যাস

১২.৫। ছোটগল্প

১২.৬। প্রবন্ধ-নিবন্ধ

১২.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১২.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১২.১। রবীন্দ্রযুগ-ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকেই কবি রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়াতে শুরু করেছিল, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল- যাতে তাঁর প্রতিভার ব্যাপক স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) থেকে 'চৈতালী' (১৮৯৬) কাব্য, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) থেকে 'মালিনী' (১৮৯৬) প্রভৃতি নাটক এবং 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাস দুটি ১৯ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব এবং বিদেশি সাহিত্য-শিল্পকলা-দর্শন প্রভৃতির ছায়া তৎকালীন বাঙালি-মানসকে কতটা রূপান্তরিত করেছিল, সমকালীন রাষ্ট্রচেতনা ও সমাজজিজ্ঞাসা সাহিত্যের মধ্যেও কী পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রথম প্রথম পৌরাণিক সংস্কারের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশিষ্ট হলেও পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পুরাণ সংস্কৃতিকে তুচ্ছ না করে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা এর মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্যকে

মন্তব্য

গ্রহণ করার দিকে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন।

১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত এই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন চলল, মহারাষ্ট্র ও বাংলায সরকারি প্রতিক্রিয়ার ফলে গুহাচারী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গোপনে শুরু হয়ে গেল। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ - এঁদের প্রভাবে নরমপন্থী কংগ্রেসের দ্বিধাসংকোচ অনেকটা কেটে গেল- অবশ্য নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের চূড়ান্ত ভেদ ঘটল সুরাট কংগ্রেসে- আর এই সময় থেকেই বাংলা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজের অঞ্চলে-বাঁধা ভারতকেও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। ফলে যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধের ঘৃণ্য বীভৎসতা, সমাজভ্রষ্টতা, চরিত্রহানি দেশকে সর্বনাশের পথে আর একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ১৯৪১ সালে শতাব্দীর সূর্য রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার রক্তাক্ত পটভূমিকায় চিরনিদ্রাবৃত হলেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ, তারপর নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আগস্ট আন্দোলন শুরু হল - ইংরেজও চণ্ডনীতিতে অত্যাচার চালাতে লাগল। এই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী মুক্তি পেয়ে আবার মুসলিম লীগের কর্ণধার মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে আপস আলোচনা চালাতে লাগলেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় সমস্ত অমুসলমান আসন অধিকার করল।

এই সমস্ত নানাপ্রকার জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রযুগের অর্ধশতাব্দীর (১৯০০-১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা সাহিত্য অভিনব অভিজ্ঞতা, রূপান্তর, মত-সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

১২.২। কাব্য-কবিতা

আমরা রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমার প্রথম তিন বছরকে শৈশব বা সূচনাপর্ব আখ্যা দিতে পারি - ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই এই পর্বের পূর্ণ বিকাশ। এই

কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য। 'শৈশবসঙ্গীত' ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এর আগে রচিত অনেক কবিতা এতে স্থান পেয়েছিল। এই সময়ের অধিকাংশ কাব্যই রোমান্টিক, গীতিধর্মী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ আখ্যানকাব্য; সে আখ্যান প্রায়ই ব্যর্থ প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং সে ব্যর্থ প্রেমের নায়ক হলেন একজন কবি। এই কবির মধ্যে দিয়ে আমাদের কিশোর-কবি অপরিণত বয়সের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা কামনা করেছেন। 'শৈশবসঙ্গীত'-এর কয়েকটি কবিতায় পরবর্তীকালের মহাকবির কিছু আভাস লক্ষ্য করা যাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, নাগরিক জীবন বহির্ভূত উদার পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে ফিরে গিয়ে মুক্তির স্বাদগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা কিশোর-কবিকে যে অ-ধরার পিছনে ধাবিত করিয়েছিল, সেই বৈশিষ্ট্যটি উত্তরকালের প্রকৃতি, প্রেম ও মানবের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ রোমান্টিকতার তুরীর লোকে উত্থিত হয়েছে।

উন্মেষ পর্ব

১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মোট চার বছরের মধ্যে তাঁর যে কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম কবি রোমান্টিক পরিমণ্ডল ত্যাগ করে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হলেন এবং এই পর্ব থেকেই তাঁর কাব্যধারার যথার্থ বিকাশ শুরু হল। এই পর্বের মধ্যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) - এই কাব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এদিক থেকে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত' দুখানি কাব্য সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ অকারণ বিষণ্ণতা, সংকীর্ণতার চেতনার বেদনা এবং আপনার মধ্যে আপনি গুটিয়ে থাকার বিড়ম্বনা যে রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তা কিছু পরিমাণে চিরাচরিত রোমান্টিক হাহুতাশেরই অঙ্গীভূত। এই যে চেতনার সীমাবদ্ধতা, এ প্রথম বিশালতর প্রাঙ্গণে মুক্তিলাভ করল 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এ।

ঐশ্বর্য পর্ব

রবীন্দ্রনাথের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে লেখা এই পর্বটিকে কেউ কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় বলতে চান। শিল্পরূপ, আবেগ, রোমান্টিকতা ও গভীর প্রত্যয়ের এরকম সমন্বয়

মন্তব্য

অন্য কোনো পর্বে এত ব্যাপকভাবে দেখা যায় নি। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালী' (১৮৯৬)- এই চারটি কাব্যের মধ্যে কবি-চেতনার এক অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যাবে।

'মানসী' কাব্যে কবি শেষপর্যন্ত মর্ত্যকেন্দ্রিক বাসনাবদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে 'অনাদি কালের হৃদয়-উৎস' থেকে প্রবাহিত 'যুগল প্রেমের স্রোতে' ভেসে গেছেন এবং ''আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা'' - এই কথা বলে দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের জগৎ থেকে বিদায় চেয়েছেন।

'সোনার তরী' রবীন্দ্র-কবিজীবনের একটা বিশেষ প্রতীক বলে গৃহীত হতে পারে। একাব্যে নিসর্গের অপূর্ব মাধুরী ব্যক্তিমানসের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। কবি যেন জাতিস্মর হয়ে সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে নিজ জীবনপ্রবাহকে অঙ্গীভূত করে উপলব্ধি করলেন ('সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা')। এই কাব্য থেকেই মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্বের প্রথম রূপটি ধরা পড়ল। প্রেমকে একটি নির্বস্তুক ভাবস্বরূপ না দেখে তাকে তিনি মানবিক প্রতীকরূপে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করলেন।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'চিত্র' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, বিশ্বসাহিত্যেও এর স্থান অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা এই কাব্যের সম্পদ। এতে মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব একটা পরিপূর্ণ সমন্বয় ও ঐক্যের মধ্যে মিলিত হয়েছে- প্রথম কবিতা 'চিত্রা', এবং 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী', 'সিন্ধুপারে' - এই কবিতাগুলি হচ্ছে রবীন্দ্র কবিজীবনের সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, জীবনদেবতা বিষয়ক বৃত্তের প্রথম সংকলন।

অন্তর্বর্তী পর্ব

'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষণিকা (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'স্মরণ' (১৯০২-১৯০৩), 'শিশু' (১৯০৬), 'উৎসর্গ' (১৯১৪) এবং 'খেয়া' (১৯১০)- মোট দশ বছরের মধ্যে দশটি কাব্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ব্যাপার। 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা'য় ইতিহাস পরিক্রমা এবং প্রাচীন ভারতীয় জীবনে পদচারণা মূর্ত হয়ে উঠল। 'কল্পনা' কাব্য এই পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপক্ক সৃষ্টি। 'কল্পনা'-র একদিকে রয়েছে প্রাচীন ভারত

আবিষ্কারের ব্যাকুলতা আর একদিকে আছে আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বীর্যবান প্রাণশক্তির জয়ঘোষণা।

'বলাকা' কাব্যের তত্ত্বলোকে কবির যে মানসমুক্তি ঘটেছিল, 'ক্ষণিকা'র মধ্যে প্রেম সৌন্দর্য ও নিসর্গলোকে সেই মুক্তি ঘটল। জগৎকে ভালোবেসে এর মানব-যাত্রায় যোগ দিয়ে 'ক্ষণিকা'র কবি ক্ষণমুহূর্তকেই অনন্তের রসে পূর্ণ করে তুললেন। কিন্তু সবশেষে কবি দেখেছিলেন - ''সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা'' - 'গীতাঞ্জলি'র সুরসাধনার প্রথম ইঙ্গিত এই পংক্তিতেই ফুটে উঠেছিল।

'চিত্রা', 'কল্পনা'র জগৎ ছেড়ে নতুন জগতের দিকে তিনি তাঁর খেয়া নৌকা ভাসালেন - এ হল 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য'-এর যুগ। একদিকে রূপজগৎ আর একদিকে অরূপজগৎ - এই দুইয়ের মাঝখানে 'খেয়া'র জগৎ। খেয়া নৌকা যেমন একঘাট থেকে অন্যঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি কবিও প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে ভক্তি ও অধ্যাত্ম সাধনার জ্যোতির্ময়লোকে যাত্রা করলেন।

গীতাঞ্জলি পর্ব

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং স্বদেশে গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রধানত 'গীতাঞ্জলি'ই দায়ী। এই 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০) সমসাময়িক এবং কোনো কোনো দিক দিয়ে সমধর্মী আরো দুটি গীতিসংগ্রহ 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) এবং 'গীতালি' (১৯১৫) - এই তিনটি কাব্যকে অবলম্বন করে এই পর্বকে 'গীতাঞ্জলি' পর্ব নাম দেওয়া যেতে পারে।

'চিত্রা' থেকে 'কল্পনা', 'খেয়া' পর্যন্ত 'জীবদেবতা', 'মানসসুন্দরী', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কবি-মানস বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে অগ্রবর্তী হচ্ছিল, 'গীতাঞ্জলি'তে তারই স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম লক্ষ্য করা যাবে।

'গীতাঞ্জলি'তে অধ্যাত্ম চেতনার আর এক ধরনের বৈচিত্র্য দেখা গেল। এটি মূলত গীতিসংগ্রহ-তত্ত্ব নয়, অধ্যাত্ম সাধনাও নয়।

বলাকা পর্ব

রবীন্দ্র কবিজীবনের সর্বশেষ পরিণত পর্বকে আমরা 'বলাকা'র নামানুসারে চিহ্নিত

মন্তব্য

করতে পারি। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) এবং 'মহুয়া' (১৯২৯) - এই পর্বের তিনটি কাব্য রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় জীবনের প্রসন্ন স্নিগ্ধতার মধ্যে রচিত হলেও এর প্রত্যেকখানিতে যে জাগ্রত জীবনবোধ, বুদ্ধির যে বিস্ময়কর দীপ্তি এবং বিশ্ব সম্বন্ধে যে বিশালতার ইঙ্গিত রয়েছে, তা তাঁর প্রৌঢ় জীবনের একপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার বলেই চিহ্নিত।

'শাজাহান', 'ছবি', 'চঞ্চল', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতায় ''ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা'' কবিকে অনন্ত গতিবেগে চঞ্চল করে তুলল। 'বলাকা' কাব্যে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক গতিবাদ স্বীকৃত হয়নি। অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন গতি আস্তিক্যবাদী কবিকে নিশ্চিত থাকতে দেয়নি। 'বলাকা' কাব্যের অন্ত্যপর্যায়ের কবিতার মধ্যে স্থির জ্যোতিবিন্দুর মধ্যে ফুটে উঠেছে। এ-কাব্যের বিচিত্র মুক্তছন্দ ও শব্দপ্রয়োগের অসাধারণ কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের যৌবন মূর্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছিল।

'পলাতকা' কাব্যের মধ্যে মর্ত্যধরিত্রীর যে রূপটি ফুটেছে, 'পূরবী'র মধ্যে সেটিই নবরূপে ও অপূর্ব দীপ্তির সঙ্গে ফুটে উঠেছে। 'পূরবী' কাব্যে আবার তিনি 'লীলাসঙ্গিনী'র হাতছানি লক্ষ্য করলেন; কিন্তু তখন যৌবনের কিংশুকঞ্জরী ঝরে পড়েছে, রবির ছন্দে পূরবীর বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হয়েছে।

অন্ত্য পর্ব

'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' (১৯৩২-১৯৩৬) চার বছরের মধ্যে প্রকাশিত হল - 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬) - অন্ত্যপর্বের প্রথমদিকের এই কয়েকটি কাব্যকে আমরা 'পুনশ্চ'-বর্গের কাব্য বলতে পারি।

অন্ত্যপর্বের শেষপর্বের কয়েকটি কাব্য এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে - 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'ছড়া' (১৯৪৩), 'শেষলেখা' (১৯৪১) - মাত্র তিন বছরের মধ্যে এতগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্বের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)।

২। উন্মেষ পর্বের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪)।

৩। ঐশ্চর্য পর্বের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪)।

৪। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী পর্বের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০)।

৫। অন্ত্যপর্বের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩)।

১২.৩। নাটক

রবীন্দ্র-প্রতিভা মূলত গীতিকবির প্রতিভা - তা তিনি নাটক, গল্প উপন্যাস যাই লিখুন না কেন। রবীন্দ্র সমালোচক ড. এডোয়ার্ড টমসন এ বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action." রবীন্দ্রনাথের নাটক, কাব্যনাটক, সাংকেতিক নাটক - সবই কবিপ্রত্যয়ের বাহনস্বরূপ।

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য

কৈশোর-যৌবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে লিরিক আবেগ, নাটকীয় ঘটনার বিকাশ এবং গীতিধর্ম মিশে গিয়ে একধরেনর বিচিত্র রস সৃষ্টি করেছিল। কৈশোর ও যৌবনে 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮),

মন্তব্য

'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪), 'কাহিনী' (১৯০০) - এ সমস্ত কখনো নাট্যধর্মী কাব্য, কখনো কাব্যধর্মী নাটক, কখনো বা গীতিনাট্য।

নিয়মানুগ নাটক

রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি সনাতন রীতির নিয়মানুগ পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করে নাট্যপ্রতিভার আর এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) এই নাটকগুলির কোনো কোনোটিতে ঘনিষ্ঠভাবে শেক্সপীয়রীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে।

'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক ট্রজেডি- রাজা বিক্রম ও রানী সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'তপতী'র মধ্যে তত্ত্বেরই প্রাধান্য, নাটকীয়তাকে তত্ত্ববাদ কিছু আচ্ছন্ন করে রয়েছে। 'বিসর্জন' ও পঞ্চাঙ্ক সনাতন আঙ্গিকের নাটক। 'প্রায়শ্চিত্ত' তাঁর প্রথম দিকে উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। তত্ত্বনাট্যযুগে 'প্রায়শ্চিত্ত' ভেঙে তিনি 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) রচনা করেন।

রঙ্গনাট্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উল্লেখযোগ্য রঙ্গনাট্যগুলি হল - 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২); ১৯২৮ সালে 'শেষরক্ষা' নামে পুরোপুরি নাটকীয় আকারে অভিনয়যোগ্য সংস্করণরূপে প্রকাশিত', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৭৯), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমারসভা' (১৯২৬;- ১৯০৮ সালে 'প্রজাপতির নিবন্ধ' নামে গদ্য-কাহিনিরূপে প্রচারিত)।

রূপক ও সাংকোতিক নাটক

'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০); 'রাজা'র সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯২০), 'অচলায়তন' (১৯১২; এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'গুরু' ১৯১৮ সালে প্রকাশিত), 'ডকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫) এবং 'কালের যাত্রা' (১৯৩২)- এইগুলি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-আশ্রয়ী সাঙ্কেতিক নাটক। অবশ্য 'শারদোৎসব'-এ ঋণপরিশোধের পটভূমিকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের মিলন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও একে সাংকেতিক নাটক বলা যায় না। 'রাজা' থেকেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাংকেতিক নাটকের শুরু।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন। যেমন - 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯)। মন্তব্য

এগুলি ছাড়াও সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতকগুলি নাটক-নাটিকা রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল- 'শোধবোধ' (১৯১৬), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'বাঁশরী' (১৯৩৩) - এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে গল্পগুচ্ছের দুটি গল্পের নাট্যরূপ।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দুটি নাট্যধর্মী কাব্যের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪)।

২। দুটি রঙ্গনাট্যের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬)।

৪। দুটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২)।

৫। রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি নৃত্যনাট্যের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯)।

১২.৪। উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

১। ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাস - 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)।

২। দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস - 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬),'যোগাযোগ' (১৯২৯)।

৩। বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস - 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫),

মন্তব্য

‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)।

৪। মিষ্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস - ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৫),
‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯)।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি ছাড়া ‘দুই বোন’ (১৯৩৩) ও ‘মালঞ্চ’ (১৯৩৪) যথার্থ উপন্যাসের আকার লাভ করতে পারেনি। এগুলি আসলে ছোটগল্পের আখ্যান, তাকে একটু দীর্ঘায়ত করে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ চারটি ভাগ - ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস, দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস, বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস এবং মিষ্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস।

২। মিষ্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাসের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৫), ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯)।

১২.৫। ছোটগল্প

ছোটগল্প বলতে একটা নতুন ধরনের শিল্পকে বোঝায়। ছোটগল্পের সংজ্ঞা হল- “A short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method.”

বাংলাদেশে গল্প আখ্যান প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথই যথার্থ ছোটগল্পের জীবনদান করেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সচেতনভাবে ছোটগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন, তিনিই এর পথনির্মাতা, আবার তিনিই এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানুষ, প্রকৃতি এবং রহস্যলোকের অতিপ্রবাকৃত ভাবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। আমাদের গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের নানা ছবি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা দশা, পারিবারিক বিরোধ, স্নেহ-প্রেমের সংঘাত ও সংকট, নানা

ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ পরিশেষে মানবধর্মের জয় ইত্যাদি বাঙালি জীবনের নানা ধরনের ছোটো বড়ো কাহিনির মধ্যে দিয়ে তিনি গোটা বাঙালি-জীবনকে দেখেছেন। সে জীবন কলকাতার নাগরিক জীবন হতে পারে, আবার গ্রাম্যজীবন হতেও বাধা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্পগুলি হল ঃ- 'একরাত্রি', 'দুরাশা', 'শেষের রাত্রি', 'মধ্যবর্তিনী', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'রাসমণির ছেলে', 'ছুটি', 'দিদি', 'ঠাকুরদা', 'নষ্টনীড়', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ', 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা' ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ছোটগল্প আসলে কী?

উত্তর ঃ ছোটগল্প হল একটা নতুন ধরনের শিল্পরূপ।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কয়েকটি ছোটগল্পের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'একরাত্রি', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'দিদি', 'নষ্টনীড়', 'অতিথি', 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি', 'মণিহারা', 'শেষকথা' ইত্যাদি।

১২.৬। প্রবন্ধ-নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রবন্ধ নিবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল ঃ-

১। **সাহিত্য সমালোচনা ঃ-** 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭),সাহিত্য'(১৯০৭)'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৩৫০)।

২। **রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা ঃ-** 'আত্মশক্তি (১৯০৫), 'ভারতবষ' (১৯০৬), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'পরিচয়' (১৯১৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১)।

মন্তব্য

৩। <u>ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ ঃ-</u> 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)।

৪। <u>ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ঃ-</u> 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯৩), 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯), 'ছেলেবেলা' (১৯৪৩), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২), 'চিঠিপত্র' প্রভৃতি।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিবন্ধের চারটি ভাগ কী কী?

উত্তর ঃ সাহিত্য সমালোচনা; রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা; ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

২। দুটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭)।

৩। দুটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১)।

১২.৭। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে কী জানো?

২। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

১২.৮। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) - সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ পর্যায়) - ভূদেব চৌধুরী।

একক-১৩ রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

বিন্যাসক্রম

১৩.১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩.২। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩.৩। যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১৩.৪। কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১৩.৫। কালিদাস রায়

১৩.৬। মোহিতলাল মজুমদার

১৩.৭। কাজী নজরুল ইসলাম

১৩.৮। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১৩.৯। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৩.১০। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

১৩.১১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩.১২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩.১৩। প্রবন্ধ-নিবন্ধ

১৩.১৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

১৩.১৫। সহায়ক গ্রন্থ

১৩.১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়জন। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, তথাপি রবীন্দ্রপ্রভাবে তিনি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যাননি, তিনি নতুনভাবে চিন্তা করার, নতুন পথে চলার প্রয়াস

মন্তব্য

করেছিলেন। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি কাব্যে জ্ঞান মননশীলতা আনয়ন করেছিলেন।

প্রকৃতিচেতনায় সত্যেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য এই যে তিনি কেবল রোমান্টিক মায়াময় ভাবনিবিড় মাধুর্যমণ্ডিত প্রকৃতির ছবি আঁকেননি, প্রকৃতির রুদ্ররূপের পরিচয়ও অঙ্কন করেছেন, যেমন- 'চম্পা'।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ স্বাদেশিক দেশবন্দনামূলক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক বেশ কয়েকটি আদর্শনিষ্ঠ জাগরণের কবিতা রচনা করেছেন। যেমন - 'আমরা', 'ছেলের দল' ইত্যাদি। জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণীভেদ, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কবির ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী চিন্তাধারারও প্রবল প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে - 'মেথর', 'শূদ্র', 'জাতির পাঁতি', 'সাম্যসাম' প্রভৃতি কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দের যাদুকর' নামেও অভিহিত।

সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ হল - 'সবিতা' (১৯০০), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬), 'হসন্তিকা' (১৯১৭), 'কাব্যসঞ্চয়ন' (১৯৩০), ছন্দঃ সরস্বতী' (১৯১৮)।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। সত্যেন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ পাওয়া যায় এমন দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'মেথর', 'শূদ্র'।

২। সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'সবিতা', 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'কাব্যসঞ্চয়ন', ছন্দঃ সরস্বতী'।

১৩.২। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্তব্য

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম এক ক্ষমতাসম্পন্ন কবি। তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক, বিশেষত বঙ্গপ্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ তাঁকে আবিষ্ট করে ও সেই পল্লীচিত্র তাঁর লেখনীতে অপরূপ হয়ে ধরা দেয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল - 'বঙ্গমঙ্গল' (১৯০১), 'প্রসাদী' (১৯০৪), 'ঝরাফুল' (১৯১১), 'শান্তিজল' (১৯১৩), 'ধানদূর্বা' (১৯২১), 'শতনরী' (১৯৩০), 'রবীন্দ্র-আরতি' (১৯৩৭), 'গীতায়ণ' (১৯৪৯)।

করুণানিধান বাস্তব জগতকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে কেন্দ্র করেই একটি অপাপবিদ্ধ গন্ধর্বলোক বা যক্ষপুরী গড়ে তুলেছিলেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'বঙ্গমঙ্গল', 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'শতনরী', 'রবীন্দ্র-আরতি', 'গীতায়ণ'।

১৩.৩। যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ছিলেন রোমান্টিক কবি। প্রেম তাঁর কাব্যের অন্যতম উপাদান, প্রকৃতিকে অবলম্বন করেও তাঁর ভাবনা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বিশেষত গ্রাম্য-প্রকৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমতা ও আকর্ষণ। যতীন্দ্রমোহন মানুষের কবি - ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য মানুষও হয়েছে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয় যাদের বেদনা যন্ত্রণা দাহকে তিনি সম্যক উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন। 'জেলের ছেলে', 'জেলের মেয়ে', 'চাষার মেয়ে' প্রভৃতি কবিতা এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে।

সাধারণ নরনারীর অন্তর্গত বেদনা নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায় যা কখনো অতীতকে অবলম্বন করে চিরন্তন জীবনযন্ত্রণাকে তুলে ধরে, আবার মর্তপৃথিবীর প্রতি অকৃত্রিম মমতায় তাঁর ভাবনা সমুচ্ছসিত হয়। রোমান্সের সহজ মায়ায় তাঁর ভাবনা নম্র ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যতীন্দ্রমোহনের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ হল - 'লেখা' (১৯০৩), 'রেখা'

মন্তব্য

(১৯১০), 'অপরাজিতা' (১৯১৫), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'নীহারিকা' (১৯২৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৩), 'পাঞ্চজন্য' (১৯১৪) প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'লেখা' (১৯০৩), 'রেখা' (১৯১০), 'অপরাজিতা' (১৯১৫), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'নীহারিকা' (১৯২৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৩), 'পাঞ্চজন্য' (১৯১৪) প্রভৃতি।

১৩.৪। কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুমুদরঞ্জন মল্লিক গ্রাম্যজীবনের কবি - বাংলার পল্লী তার সৌন্দর্য শান্তি স্নিগ্ধতা নিয়ে তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে। পাড়াগাঁর সহজ সরল আন্তরিক জীবন এবং সুন্দর রূপময় মায়ামদির প্রকৃতি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

কুমুদরঞ্জন ভক্তিরসের কবি। একটি তদ্‌গত ভক্তিনম্র প্রাণের পরিচয় তাঁর কবিতায় আছে। তাঁর অবলম্বন ছিল বৈষ্ণব ঐতিহ্য।

কুমুদরঞ্জন ১২টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন যাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল 'শতদল' (১৯০৬), 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'অজয়' (১৯২৭), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'শতদল' (১৯০৬), 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮) প্রভৃতি।

১৩.৫। কালিদাস রায়

কালিদাস রায় রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে বিশিষ্ট এবং সর্বাধিক খ্যাতিমান শিল্পস্রষ্টা শিক্ষাবিদ কবি চাকরিসূত্রে শহরবাসী হলেও গ্রামজীবনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর

ভালোবাসা- বাংলার পল্লীপ্রকৃতি তার সহজ সৌন্দর্য নিয়ে কালিদাস রায়ের কাব্যে উদ্ভাসিত, বিশেষত রায়ের পল্লীশ্রী অপরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। মন্তব্য

কালিদাস রায় আঙ্গকেরও নিপুণ শিল্পী। কালিদাস রায় ছিলেন রসজ্ঞ পণ্ডিত। বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। যেমন- 'পদাবলী সাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'শরৎসাহিত্য' ইত্যাদি। কালিদাস রায় প্রায় কুড়িটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে আছে 'কুন্দ' (১৯০৭), 'কিশলয়' (১৯১১), 'পত্রপুট' (১ম-১৯১৪, ২য়-১৯২১), 'ব্রজবেণু' (১৯১৫), 'বৈকালী' (১৯৩৮), 'গাথাঞ্জলি' (১৯৫৭), 'পূর্ণাহুতি' (১৯৬৮) প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কালিদাস রায়ের দুটি সমালোচনামূলক কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'পদাবলী সাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'।

২। কালিদাস রায় রচিত চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'কুন্দ' (১৯০৭), 'কিশলয়' (১৯১১), 'ব্রজবেণু' (১৯১৫), 'বৈকালী' (১৯৩৮)।

১৩.৬। মোহিতলাল মজুমদার

মোহিতলাল মজুমদার বাংলা কাব্যে এনেছেন প্রবল পৌরুষ দুর্দমনীয় বীর্যবত্তা। কবিতার ভাবনাকে তিনি করেছেন কঠিন দীপ্ত, কবিতার শিথিল আঙ্গিকেও এনেছেন ক্লাসিক সংহতি, ভাস্কর্যের সুঠাম অবয়ব মোহিতলাল প্রথমদিকে ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী, ভারতী গোষ্ঠীর লেখক তিনি।

তিনি প্রেমের কবি, কিন্তু প্রেমকে তিনি দেহসীমার ঊর্ধ্বে আত্মার অনুভবের বিষয়মাত্র করেননি, দেহাতীত কল্পলোকে তার অধিষ্ঠান ঘটেনি।

উদ্দাম উল্লসিত দুর্বার জীবনের কবি মোহিতলাল। কবি ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে পারেননি। যে মানুষের ঊর্ধ্বে দেবতার অধিষ্ঠান, মানুষকে, সত্যপৃথিবীকে, ধূলিধূসর

মন্তব্য

জীবনকে পরিহার করে যে ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন তিনি কখনোই কবির আরাধ্য হতে পারেন না।

মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ হল- 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্তগোধূলী' (১৯৪১), 'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৯৪১)। প্রায় কুড়িটি প্রবন্ধগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৩৬), 'সাহিত্যবিতান' (১৯৪১), 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৪৭), 'বঙ্কিমবরণ' (১৯৪৯), 'রবিপ্রদক্ষিণ (১৯৪৯), 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' (১৯৪৭) প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মোহিতলালের দটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭)।

২। মোহিতলালের দুটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৩৬), 'বঙ্কিমবরণ' (১৯৪৯)।

১৩.৭। কাজী নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে অগ্নিহোত্রী কবি নজরুল প্রলয় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে এক প্রবল অগ্নিদহনে অন্যায় দুর্নীতিকে বিদূরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অগ্নিবীণায় ঝঙ্কৃত হয়েছে আগুনের সুর যা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ঝলসে দেয়।

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বিপ্লবের বিদ্রোহে শিল্পবাণী 'অগ্নিবীণা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। নজরুলের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হল - 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সিন্ধু হিল্লোল' (১৯২৭), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮), 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) ইত্যাদি। তাঁর বিশিষ্ট অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ - 'রুবাইয়া-ই-হাফিজ' (১৯৩৯), 'রুবাইয়া-ই ওমর খৈয়াম'।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

মন্তব্য

১। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কী?

উত্তর ঃ অগ্নিবীণা।

২। নজরুলের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪)।

১৩.৮। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ কাব্যপ্রসঙ্গে নিয়ে এলেন মরুর দহনজ্বালা, খরতাপে ঝলসে দিতে চাইলেন সুন্দরের কোমল নমনীয় পরিবেশকে, রবীন্দ্রনাথের দিব্যভাবময় অলোকসামান্য শিল্পের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করলেন।

যতীন্দ্রনাথের প্রতম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' (১৯১২) আনল মরুভূমির বার্তা যা এই বিবর্ণ প্রাণহীন শুষ্ক কঠোর জীবনের সত্যকেই ব্যঞ্জিত করে। তারপর প্রকাশিত হয় 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০) যে দটি কাব্য মরুধূসর ঊষর রিক্ত সমাজভাবনারই প্রতিরূপ। অবশ্য পরবর্তীকালে করি পরিবর্তিত মানসিকতা - সৌন্দর্যপিপাসা, হৃদয়ভাবনা, প্রকৃতি, অনুধ্যান প্রভৃতি - রূপ পায় 'সায়ম' (১৯৪১) ও 'ত্রিযামা'য়। কবি গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে 'গান্ধী বাণী কণিকা'য় (১৯৪৮)।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কী?

উত্তর ঃ 'মরীচিকা'।

২। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' ইত্যাদি।

মন্তব্য

১৩.৯। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আজো রঙ্গমঞ্চের এক উজ্জ্বল পুরুষরূপে অনন্য মর্যাদার অধিকারী।

তাঁর প্রহসনগুলি ব্যঙ্গে বিদ্রুপে তীক্ষ্ণ ধারালো-বিশেষত বিলেতফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতদের তিনি বিদ্রুপ করেছেন যেমন 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫) নাটকে, তথাকথিত শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা নারীদের আক্রমণ করেছেন 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) নাটকে। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'পুনর্জন্ম' (১৯১১)। তাঁর অন্যান্য প্রহসন হল - 'বিরহ' (১৯১১), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৮৯৭), 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) দুটি সামাজিক নাটকও দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন - 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)।

দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি পৌরাণিক নাটক লিখেছেন- 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) ও 'ভীষ্ম' (১৯১৪)।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক হল - 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) ও 'সিংহলবিজয়' (১৯১৫)।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি পৌরাণিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮)।

২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫)।

১৩.১০। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় চল্লিশটি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'বভ্রবাহন' (১৮৯৯), 'সাবিত্রী' (১৯০২), 'উলূপী' (১৯০৬), 'ভীষ্ম' (১৯১৩) এবং 'নরনারায়ণ' (১৯২৬)।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে বিশিষ্ট 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৬), 'পদ্মিনী' (১৯০৭), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৭), 'আলমগীর' (১৯২১) প্রভৃতি। মন্তব্য

লেখকের রঙ্গনাটক বা গীতিনাটকের মধ্যে স্মরণীয় 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪), 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'জুলিয়া' (১৮৯৯), 'বেদৌরা' (১৯০২), 'বাসন্তী' (১৯০৮), 'কিন্নরী' (১৯০১)।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের দুটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৬), 'পদ্মিনী' (১৯০৭)।

২। ক্ষীরোদপ্রসাদের দুটি রঙ্গনাটক বা গীতিনাট্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪), 'আলিবাবা' (১৮৯৭)।

১৩.১১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমকালে আবির্ভূত হয়েও নিজের স্থান সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

প্রভাতকুমার চৌদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন তাদের মধ্যে 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'সিন্দুর কৌটা' (১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২), 'জীবনের মূল্য' (১৯২৩), 'আরতি' (১৯২৪) ইত্যাদি।

ছোটগল্পতেই প্রভাতকুমারের প্রতিভা সম্যক পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর রচিত শতাধিক ছোটগল্প রয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলি হল - 'বলবান জামাতা', 'দেবী', 'মাস্টার মশাই', 'কাশীবাসীনি', 'উকীলের বুদ্ধি', 'খালাস', 'মাদুলি' ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। প্রভাতকুমারের দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

মন্তব্য

উত্তর ঃ 'নবীন সন্ন্যাসী', 'মনের মানুষ'।

২। প্রভাতকুমারের দুটি ছোটগল্পের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'বলবান জামাতা', 'দেবী'।

১৩.১২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপরাজেয় অভিধায় সার্থকভাবেই ভূষিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - শরৎচন্দ্র বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল - 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজ-বৌ' (১৯১৪), 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪) ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'বড়দিদি', 'বিরাজ-বৌ।

১৩.১৩। প্রবন্ধ-নিবন্ধ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ- 'বাংলা ব্রত' (১৯০৯), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপরীর দেশ' (১৩২২), 'খাতাঞ্জির খাতা' (১৩২৩), 'বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' (১৯৪৯), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৩৫০), 'ঘরোয়া' (১৩৪৮), 'আপনকথা' (১৩৫০)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ- 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০), 'শব্দকথা' (১৩২৪), 'বিচিত্রজগৎ' (১৯২০), 'চরিত্রকথা' (১৯১৩), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬), 'শব্দকথা' (১৯১৭), 'জগৎকথা' (১৯২৬)।

প্রমথ চৌধুরী ঃ- 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩), 'পদচারণা' (১৯১৯), 'তেল-নুন-লকড়ী' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'নানা চর্চা' (১৯৩২) প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'বাংলার ব্রত', 'রাজকাহিনী'।

২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দুটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০)।

৩। প্রমথ চৌধুরীর দুটি প্রবেন্ধর নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩), 'পদচারণা' (১৯১৯)।

১৩.১৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। কাব্যকবিতার জগতে সতেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ভূমিকা আলোচনা করো।

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩। প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্পর্কে কী জানো লেখো।

১৩.১৫। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বঙ্গভূমিকা - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-১৪ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য

বিন্যাসক্রম

১৪.১। সূচনা

১৪.২। কবিতার নতুন ধারা

১৪.৩। সাম্প্রতিক নাটক

১৪.৪। কথাসাহিত্যে আধুনিকতা

১৪.৫। সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ

১৪.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১৪.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১৪.১। সূচনা

সাম্প্রতিক অর্থাৎ রবীন্দ্রন্তোর বাংলা সাহিত্যের আলোচনা, ইতিহাস রচনা ও গুণাগুণ বিচার বড়ো দুরুহ, কিছু বিপজ্জনকও বটে। অধুনা বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মতো দূরকালের যথেষ্ট দূরত্ব নেই এবং যাঁদের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসবে তাঁরা এখনো সাহিত্যকর্মে নিঃশেষ হয়ে যাননি। অত্যন্ত কাছে থাকার জন্য তাঁদের স্বরূপবিচার ও মূল্যাবধারণও দুরূহ হয়ে পড়ে।

১৪.২। কবিতার নতুন ধারা

আধুনিক তথা সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মূল রহস্য নিহিত আছে সমকালের ইংরেজি কবিতার মধ্যে। আধুনিক কবিরা সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম রবীন্দ্রভাব মণ্ডলের মধ্যে নতুন ধরনের কাব্যপ্রকল্পের জন্মদান করেন।

কবি অজিত দত্ত আধুনিক পন্থার প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আধুনিক কবিতার নেতৃত্বও করেছিলেন। 'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্ট চাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৩৪৫), 'ছায়ার

আলপনা' (১৯৫১) প্রভৃতি কাব্যে যেমন উৎকট ভাষাভঙ্গি নেই, তেমনি কোনো উদ্ভট ভাবেরও আড়ম্বর নেই। মন্তব্য

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র একসময় আধুনিক জীবনকে কাব্যে অবতারিত করেছিলেন অনেকটা মার্কিনী মানববাদী কবি ওয়াল্ট হইটম্যানের আদর্শে। 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৫০), 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যে তাঁর বলিষ্ঠ কবি মানসের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তাকে বিশুদ্ধ ধরনের মানববাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' এছাড়া তাঁর কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ হল- 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫২)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঠিক যেন জীবনানন্দের বিপরীত। তাঁর প্রথম কাব্য 'তন্বী' (১৯৩০) বিশেষ কোনো মৌলিকতা বহন করেনি। 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬), 'দশমী' (১৯৫৬) প্রভৃতি কাব্যে সুধীন্দ্রনাথের অদ্ভূত কবিত্বরূপের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সাধারণ পাঠকসমাজে তিনি দুরুহতম কবি বলে পরিচিত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন সংগ্রামী মানুষের কবি হিসেবে।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। অজিত দত্তের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮)।

২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৫০)।

৩। জীবনানন্দ দাশের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

মন্তব্য

উত্তর ঃ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা' সেন' (১৯৪২)।

৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭)।

১৪.৩। সাম্প্রতিক নাটক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইদানীং নাট্যাভিনয় ও নাট্যকলার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, রঙ্গমঞ্চের দৈন্য অনেকটা ঘুচেছে। অবশ্য অধিকাংশ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এখনও অর্ধশতাব্দী বা তার চেয়েও পুরাতন নাটক যথেষ্টহ অভিনিত হয়। কেউ কেউ সাম্প্রতিক জীবন ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে টেকনিসর্বস্ব চটকদারি নাটক লিখেছেন, অনিয়ে যা খুব জমে উঠেছে।

বিজন ভট্টাচার্য ('নবান্ন' - ১৯৪৪), দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ('অন্তরঙ্গ', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা' ইত্যাদি), তুলসী লাহিড়ী ('ছেঁড়া তার', 'উলখাগড়া', 'পথিক'), সলিল সেন ('নতুন ইহুদী') প্রভৃতি নাট্যকারেরা এ যুগের সমাজ-সমস্যার ভয়াবহ রূপ নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপর ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্ত ('অঙ্গার', মানুষে অধিকারে', 'কল্লোল', 'টিনের তলোয়ার', 'ব্যারিকেড' প্রভৃতি) ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ('নাট্যকারের সন্ধানে কয়েকটি চরিত্র', 'মঞ্জুরী আমের মঞ্জরী', 'ভালোমানুষের পালা') কয়েকখানি নাটক সমাজের মুকুর হিসেবেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি নাটকের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'অন্তরঙ্গ', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা' ইত্যাদি।

২। উৎপল দত্ত রচিত কয়েকটি নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'টিনের তরোয়াল' প্রভৃতি।

৩। তুলসী লাহিড়ীর দুটি নাটকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া'।

৪। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি নাটকের উদাহরণ দাও। মন্তব্য

উত্তর ঃ 'নাট্যকারের সন্ধানে কয়েকটি চরিত্র', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'ভালোমানুষের পালা' ইত্যাদি।

১৪.৪। কথাসাহিত্যে আধুনিকতা

বাংলা উপন্যাস ও ছোট্টগল্পের ক্ষেত্রে 'তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল মিত্র- এঁরা আধুনিক সমাজপরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে কোথাও-বা ধূসর ইতিহাসে ফিরে গিয়ে গতযুগের সাহিত্যধারাকে অনুসরণ করে চলেছেন।

বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক-দশক-শতক', 'বেগম মেরী বিশ্বাস'; রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ'; অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নীলভুঁইয়া', প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা'; শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার', 'অমাবস্যার গান'; প্রতাপচন্দ্র চন্দের 'জব চার্ণকের বিবি' প্রভৃতি ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

মনীন্দ্রলাল বসুর ড্রয়িংরুম-বিলাসী কৃত্রিম কথাগ্রন্থ অসহ্য মনে হচ্ছে, 'যুবনাশ্ব'-এর (মনীশ ঘটক) 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'ও স্থূল বাস্তবের সংকীর্ণতা ছাড়াতে পারছে না। প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী', 'সিন্ধুপারের পাখী'; মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল'; সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'; অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি উপন্যাসে কলকাতার পরিচিত সমাজ ও গতানুগতি মানবযাত্রাকে ছেড়ে দিয়ে অজ্ঞাত-পরিচয় বাংলা এবং বালংার বাইরের পটভূমিকায় নতুন করে জীবনচিত্র আঁকাবার চেষ্টা চলেছে - যে জীবনচিত্র বিচিত্র, অভিনব ও বলিষ্ঠ।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। আধুনিক সমাজ পরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছিলেন এমন কয়েকজন লেখকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র।

মন্তব্য

২। বিমল মিত্রের দুটি রচনার নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'।

৩। আধুনিক উপন্যাস রচনা করেছেন এমন কয়েকজন লেখকের নাম লেখো।

উত্তর ঃ প্রফুল্ল রায়, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মন প্রমুখ।

১৪.৫। সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব); ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে', 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'; ড. শ্রীকুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'; ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'; ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য'; ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন'; বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গ- সংস্কৃতি' প্রভৃতি গবেষণা গ্রন্থের দ্বারাই বোঝা যাবে বাঙালি মনীষা নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কতটা সজাগ হয়েছে।

শঙ্করের 'কত অজানারে', 'চৌরঙ্গী'; জরাসন্ধের 'লৌহকপাট', 'তামসী'; আনন্দকিশোর মুন্সীর 'ডাক্তারের ডায়েরী'; সুকন্যার 'খড়ির লিখন'; ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'যখন পুলিশ ছিলাম', 'যখন নায়ক ছিলাম'; সমরেশ বসুর কালকূট ছদ্মনামে লেখা 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আধুনিক পাঠকসমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। জরাসন্ধের প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'লৌহকপাট', 'তামসী'।

২। আনন্দকিশোর মুন্সীর লেখা একটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ 'ডাক্তার ডায়েরী'।

৩। সমরেশ বসুর লেখা প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’। মন্তব্য

১৪.৬। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। কবিতার নতুন ধারা আধুনিক সাহিত্যে কীভাবে জায়গা করে নিয়েছিল তা আলোচনা করো।

২। সাম্প্রতিক নাটক বলতে কী বোঝ?

৩। কথাসাহিত্যে কীভাবে আধুনিকতার সূত্রপাত হল তা আলোচনা করো।

৪। সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

১৪.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

২। বঙ্গভূমিকা - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। বাঙালীর ইতিহাস - নীহাররঞ্জন রায়।